বিদায়

- - এসএম আছাব আলী

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে আমার চাকরি জীবনের শেষ পাচটি বছর *বিএনএস পাবনা* (বর্তমানে কোস্টাল গার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত) নামের এক পেট্রল ক্রাফট–এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে খুলনার গোয়ালপাড়ায় নাবিক কলোনিতে থাকতো। একটি ছোট্ট জাহাজ। উনিশ বিশজন নাবিক। পারিবারিক পরিবেশ। এখান থেকেই আমাকে ১৯৯১ সালের ২৭ অক্টোবর চাকরি জীবনের সমাপ্তি ফেয়ারওয়েল পার্টি দেয়া হয়েছিল। তাদের দেয়া উপহার সামগ্রীর মধ্যে কাচ দিয়ে বাধানো হাতে লেখা একটি মানপত্র ও একটি ছাতা যা আমার হৃদয়কে এখনো ভালোবাসায় আপ্লুত করে।

সেদিন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাসায় পৌছালাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে কলোনির মধ্যেই স্কুল।

ডায়াবেটিস আক্রান্ত অসুস্থ স্ত্রী বিছানায় শায়িত। আমার মন এলোমেলো, বিষণ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট। ছেলে হাত থেকে ছাতা নিয়ে তার মাথার উপর মেলে ধরে বললো, বাহ! ভারী সুন্দর ছাতা।

হ্যা, ছাতাটা সুন্দরই বটে। শাদা প্লাস্টিকের হাতল। ভেতরে লাল ফুলের মনোগ্রাম। কালো মসৃণ কাপড়। ভেতরে শাদা রঙ দিয়ে অতি সুন্দর করে আমার নাম, ঠিকানা ও সৌজন্য *বিএনএস শিপস কম্পানি, পাবনা* লেখা। খাচার পাখিকে মুক্ত করে দিলে প্রথমে সে হতবাক হয়। ভেতরে শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। আহার ও বাসস্থানের চিন্তা করে।

আমারও সেই অবস্থা হলো। স্ত্রী অসুস্থ। ছেলে স্কুলগামী। গ্রামের বাড়িতে আমার ভবিষ্যৎ জীবন কেমন কাটবে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে স্ত্রী উঠে এলো। তার শরীরের সমস্ত রোগ, দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে সুন্দর করে হাসলো। তার গোলাপি ফর্শা গালে টোল পড়লো। শাদা ছোট ছোট দাতে জ্যোতি ছড়িয়ে ছেলের হাত থেকে ছাতা নিয়ে আমাকে ও ছেলেকে ছাতার মধ্যে টেনে নিয়ে বললো, তুমি ভয় পেয়েছো? আজ আমার খুব ভালো লাগছে। এই ছাতা মানে তোমার পেনশনের টাকা দিয়ে বাবুর লেখাপড়া চালাবো। আর জমির ফসল দিয়ে আমাদের দুজনার ক্ষুদ্র জীবন চলবেই। এরপর সে প্রচুর হাসলো এবং আমাকেও হাসিয়ে ছাড়লো।

১৯৯১ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে আমার অবসরকালীন ছুটি শুরু হয়। নিয়ম অনুসারে সরকারি বাসা ছেড়ে দিতে হলো। মনে আছে, চাকরি ছাড়ার চেয়ে বাসা ছাড়ার বেদনা আরো গভীর। ১০/২ নাম্বার এই দোতলা বাসায় সাতটি পারিবারিক বছর কেটেছে। এখানে জীবন ছিল খুবই নিবিড়। স্নেহ

ভালোবাসার আলোয় উজ্জ্বল। একটি সুশৃঙ্খল জীবন পদ্ধতি ছিল। সৎ উপার্জন ছিল। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও ছেলেমেয়ের শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করি। তারপর জীবনের মহামূল্যবান ৩০টি বছর অতিক্রম করে ৪৮ বছর বয়সে অবসর নেয়া। হিসাবের কোনো গরমিল নেই।

মালামাল ট্রাকে করে আগেই বাড়ি পাঠানো হয়েছিল। আমরা মেল ট্রেন ধরবো। তখন খুলনা–সান্তাহার আন্তঃনগর ট্রেন ছিল না। অল্প কিছু জিনিসের সঙ্গে ছাতাটাও ছিল। বিদায় মুহূর্তে আমার স্ত্রী ছাতাটা আমার হাতে দিয়ে বললো, তুমি শুধু ছাতাটার খেয়াল রাখবে।

তার মুখের দিকে তাকালাম। সাত বছর আগে যখন তাকে গ্রামের বাড়ি থেকে এই বাসায় আনি তখন সে ছিল স্বাস্থ্যবতী। সম্পূর্ণ সুস্থ। পারিবারিক একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় স্বল্পভাষী কোমল হৃদয়ের এই মানুষটি দুঃখ, বেদনা, শঙ্কায় গভীরভাবে আহত হয়। আমার অজান্তে আহার, নিদ্রায় চূড়ান্ত অনিয়ম করে এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। আমার চোখে পানি এলো। ছাতা হাতে গাড়িতে উঠে বসলাম। নৌবাহিনীর একটি পিকআপ খুলনা রেল স্টেশনে আমাকে শেষ বিদায় জানালো।

গ্রামে এসে পরিত্যক্ত এলোমেলো মাটির ঘর আবারও পরিপাটি করে সাজানো হলো। দেয়ালে আমাদের যুগল ছবি, মানপত্র ও কাগজের মোড়কে আবদ্ধ আমাকে উপহার দেয়া সেই ছাতাটিও টাঙানো হলো। বললাম, ছাতাটা এখানে টাঙালে কেন?

আমার স্ত্রী বললো, এই ছাতা তোমার চাকরি জীবনের শেষ স্মৃতি। নিঃসঙ্গতা, বেদনা ও বিষণ্নতা যখনই তোমাকে আঘাত করবে তখনই এই ছাতা তোমাকে ছায়া দেবে, সান্ত্বনা দেবে, আনন্দ দেবে।

আমি আবারও হাসলাম।

আমার স্ত্রীর ডায়াবেটিস আরো বাড়তে লাগলো। বগুড়া ডায়াবেটিক সমিতিতে তাকে সদস্য করালাম। মাসে মাসে তার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করতাম। তার শরীরে দিনে তিনবার ইনসুলিন পুশ করতে হতো। তবু তাকে নিরাপদ নিয়ন্ত্রণে রাখা গেল না।

চাকরি জীবনের স্মৃতিকে চিরজাগরুক করে রাখার জন্য ছাতাটা দেয়ালে টাঙানোই থাকে। খুব একটা ব্যবহার করি না। কিন্তু এক বর্ষার দিনে পাশের গ্রামে এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ছাতাটা হারিয়ে ফেললাম। সে খুব মন খারাপ করলো। চোখে মুখে বেদনার ছায়া এসে পড়লো। বললো, থানায় একটা ডায়রি করো, পেপারে বিজ্ঞপ্তি দাও।

আমি এসব কিছুই না করে সেই বিয়ে বাড়ির কর্তাকে ছাতাটা খুজে দেয়ার অনুরোধ জানালাম।

১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ বিকেল স্বামী–স্ত্রী দুজনেই ওজু করে ঘরে ঢুকছি। মাগরিবের আজান হয়েছে নামাজ পড়বো। জায়নামাজে না গিয়ে সে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। আমিও ত্রস্তভাবে তার পাশে বসলাম।

কি হচ্ছে?

বুকে ব্যথা!

ডাক্তারের পরামর্শের কথা মনে পড়লো। হার্টের রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট একটা ছোট শাদা বড়ি তার জিভের নিচে ঢুকিয়ে দিলাম।

সে বললো, এই ব্যথা সেই ব্যথা নয়।

এটাই ছিল তার শেষ কথা।

ঘরের বাইরে নিয়ে তার মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। প্রথমে তার দুই পা অনড় হলো। তারপর দুই হাত, এরপর দুই চোখ বুজলো। নিঃশ্বাস ধীরে চলতে থাকলো। এর আগেও তার দুইবার স্ট্রোক করেছে। বুঝলাম এটাই তার শেষ স্ট্রোক।

প্রথমে পাড়া প্রতিবেশী, তারপর সমস্ত গ্রামবাসী আমার উঠানে উপচে পড়েছে। সে ছিল সকলের প্রিয়পাত্রী। রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে তার শেষ নিঃশ্বাসটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্যু এসে আমার প্রিয়তমাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলো। মুখ তুলে দেখলাম সবাই কাদছে।

গল্পটা এখানেই শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু তা হলো না।

একদিন সেই বিয়ে বাড়ির কর্তাব্যক্তি ছাতাটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেলেন।

ছাতাটা দেওয়ালের ঠিক সেইখানে টাঙিয়ে রাখলাম। ছাতা আছে, ছবি আছে, সে নেই। আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছি। এখন ছাতাটা পুরনো, মলিন, ধুলায় ধুসরিত। ঠিক আমার জীবনের মতো নিঃসঙ্গ। হৃদয়ের গভীরে নিঃসঙ্গতার ব্যথা যেন তার শেষ কথা – *এই ব্যথা সেই ব্যথা নয়।*

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

অপেক্ষা

– – মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান রানা

সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, আমাদের একটি সুন্দর সবুজ রঙের ছাতা আছে। কিন্তু সেই ছাতাটি কখনো ব্যবহার করা হয়নি। সব সময় আলমারিতে তোলা থাকে।

বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করতে চাইলে আম্মা বলেন, পানিতে নষ্ট হয়ে যাবে। আর গরমের সময় বলেন, রোদে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আম্মুকে কতো বলি যে, এই ছাতাটি নিয়ে বাইরে গেলে সবাই বলবে কতো সুন্দর ছাতা। তবুও তিনি দেন না।

একদিন কথায় কথায় বললেন, তোর যেদিন বিয়ে হবে সেদিন তোকে এই ছাতা দেবো। তাই ছাতা আলমারিতেই তোলা থাকে এবং আমিও প্রতীক্ষায় আছি কবে বিয়ে হবে আর ছাতাটি ব্যবহার করবো।

পাবনা থেকে

কঙ্কাল

– – নূরে আলম ভূইয়া

পুরনো বাক্সটার গায়ে ধুলো ময়লা মাখামাখি হয়ে আছে। অনেক দিন খোলা হয় না বাক্সটা তা বোঝাই যায়। মা বছরে দুই একবার বাক্সটার গা পরিষ্কার করেন। কিন্তু তিনিও বাক্সটা খোলেন না সচরাচর। কেন খোলেন না সে প্রশ্ন মাকে কখনো করা হয়নি। অবশ্য আমারও বাক্সটা কখনো খুলতে ইচ্ছা করে না। বাক্সটার দিকে নজর গেলেই পুরনো ক্ষতটা আবার যেন জেগে ওঠে। তাই এটার ধারেকাছে কখনো ঘেষতে ইচ্ছা করে না। বাক্সটা খুলে ক্ষতগুলোকে জাগিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে না।

একবার বাড়ি গিয়ে আমার ইচ্ছার পরিবর্তনটা হলো অকস্মাৎ। মায়ের কাছ থেকে বাক্সে তোলার চাবিটা নিয়ে সোজা উঠে গেলাম দুই তলা মাটির ঘরের পাটাতনে। দুটো ইটের ওপরে বসানে বাক্সটার একেবারে ওপরে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ধুলো ময়লা জমে আছে সারা বাক্সের গায়ে। প্রথমেই সেগুলো পরিষ্কার করলাম। তারপর তালাটা খুললাম। বাক্সটা মেলতেই দুই চোখ আমার জল ভরে এলো। উইপোকা বাসা বেধেছে এর ভেতরে। তাই তড়িঘড়ি করে ভেতর থেকে কিছু কবিতা, উপন্যাস এবং প্রবন্ধের বই বের করে আনলাম। প্রতিটা বইয়ের আংশিক খেয়ে ফেলেছে উইপোকা। চিঠিগুলোও এভাবে খেয়েছে।

বুবু আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন যখন আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। লিখেছিলেন, *লক্ষ্মী ভাইয়া আমার, খুব সুন্দর হয়েছিস তুই। কাছে থাকলে তোকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতাম। নানুর বাড়ি গিয়ে ছোট খালাকে জ্বালাতাম। অনেক আদর করতাম তোকে।*

চিঠির এ লেখাগুলো খেয়ে ফেলেছে উইপোকা। বুবু বই পড়তে খুব পছন্দ করতেন। এগুলোও ছাড়া পায়নি পোকাগুলোর হাত থেকে। একাডেমিক বিভিন্ন কাগজপত্র, বুবুর ডায়েরি এবং বইপত্রগুলো বাক্স থেকে নামিয়ে আনলাম।

বাক্সের এক পাশে নিচে রাখা কালো ছাতাটার কঙ্কাল রূপ দেখে আবারও চোখ দুটো জলে ভরে এলো আমার। ছাতার কাপড় পোকাগুলো খেয়ে ফেলেছে। বুবু যখন ঢাকার বাসায় থেকে বাংলা কলেজে পড়াশোনা করতেন তখন কিনেছিলেন ছাতাটা। ওজনে পাতলা এবং ছোট ছাতাটার সুইচ টিপলেই খুলে যেতো এবং টেনে আবার বন্ধ করে পেচিয়ে রাখা যেতো। বুবু ছাতাটা ঢাকা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর খুব পছন্দ হয়ে গেল আমার। সুইচ টিপলেই এটা খুলে যায় এ ব্যাপারটা খুব ভালো লাগতো আমার। আমি সবার ছোট এবং আদরের থাকায় ছাতাটা ব্যবহারের অনুমতি পেলাম সহজেই বুবুর কাছ থেকে। বাল্যকালের সেই দুই তিন দিন ছাতাটা সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম। স্কুলে গেলেও ছাতা, বাইরে ঘুরতে গেলেও ছাতাটা সঙ্গে রাখতাম। সুইচ টিপে খুলতাম আর বন্ধ করতাম। মা দেখে ধমকাতেন। বুবু বলতেন, করুক না, দুদিনই তো বাড়িতে আছি।

বুবু ঢাকা চলে আসার সময় ছাতাটা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুবুর প্রয়োজনের কথা ভেবে নিইনি। বুবু খুশি হয়ে আমাকে বলেছিলেন, আবার যখন আসবো তখন তোর জন্য এ রকম সুন্দর একটা ছাতা নিয়ে আসবো। কিন্তু বুবু আর ছাতা নিয়ে ফেরেনি। দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে পিণ্ড পিণ্ড লাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন বুবু। আমার মনে সেদিন বুবুর ছাতা নিয়ে ফেরার কথাটা খুব দোলা দিচ্ছিল।

আজ অনেক দিন পর বুবুর মতো বুবুর ছাতাটাও কঙ্কাল হয়ে গেছে। বইগুলো ক্ষয়ে গেছে। ছাতার লোহার অংশগুলোতে জং পড়ে গেছে। বুবুর স্মৃতিচারণ করতে করতে জিনিসপত্রগুলোর অবশিষ্টাংশ যা আছে ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম। নতুন একটা বাক্স কিনে তাতে আলকাতরা মাখালাম ভালো করে। এরপর বাক্সটা শুকিয়ে বুবুর জিনিসপত্রগুলো তাতে রাখলাম। যা অবশিষ্ট আছে তা সযত্নে থাক। সযত্নে থাক বুবুর কঙ্কাল ছাতা।

মা সব দেখেও কিছু বললেন না। আন্দাজ করলাম কয়েকবার হয়তো মা চোখ মুছেছেন।

বুবুর মৃত্যুর পর ছাতাটা ভালো থাকলেও কেউ আর ব্যবহার করেনি। আর এখন কেউ ব্যবহার করবেও না। কিন্তু আমাদের পরিবারের সবার ব্রেইনের মেমোরি সেলে রয়ে যাবে ছাতাটার স্মৃতি। মাঝে মাঝেই মনে হবে বুবুর ছাতা।

সাভার থেকে

প্রাকৃতিক

- - আসমা চৌধুরী জয়িতা

আমার নানার হাতে সব সময় ছাতা থাকেই। শরৎ, শীত সব কালেই। দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বিভিন্ন কাজে লাগে। বৃদ্ধ মানুষ, লম্বা ছাতার হাতায় ভর দিয়ে চলাচল করেন। এ ছাতা দিয়েই গরু, ছাগল তাড়িয়ে চলেন। এমনকি সাপকেও দোয়া দরুদ পড়ে লম্বা ছাতার আগা দিয়ে গুতো দিয়ে সরিয়েছেন।

সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটে ১৯৯৭ সালে। নানার খুব ঘনিষ্ঠ গ্রামের মাতব্বর গোছের একজনের সঙ্গে গ্রাম্য সালিশে যাচ্ছেন। হঠাৎ লোকটির তীব্র প্রকৃতির ডাক চাপে। গ্রাম্য রাস্তার আশপাশে বাড়ি-ঘর খুব কম এবং লজ্জায় যেতেও পারবেন না। আর তখনি বুদ্ধি খেলে যায় নানার। বৃহৎ ছাতা মেলে ধরে লোকটি খেতের আইলে বসে পড়েন। মাটির চাকায় শৌচকার্যাদি সারেন। প্রাকৃতিক কর্ম সারার পর ওনার মুখে যে প্রশান্তি দেখেছিলেন তা মনে পড়লে নানা নাকি মনে মনে এখনো হাসেন।

আমরা এ কাহিনী শুনে হাসির বেগ সামলাতে পারিনি। ছাতার উপকারের বহু দিকের মধ্যে এ রকম অবদান কখনো ভাবিনি। বুঝুন, ছাতা আমাদের কতো উপকারী!

ময়মনসিংহ থেকে

আশার আলো

কামরুজ্জামান

দেখুন, আপনার নতুন বিয়ে হয়েছে। তার উপর আপনার বয়স অল্প। এই অল্প বয়সে বাবা-মায়ের উচিত হয়নি আপনাকে বিয়ে দেয়াটা। যেহেতু বিয়েটা হয়েই গেছে সেহেতু এখন থেকে পরিবার পরিকল্পনা মাফিক নিজের স্বাস্থ্য ও স্বামীর সুখ বিবেচনা করে চলতে হবে। আপনাকে ব্যবহার করতে হবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো। কথার ফাকে খাবার বড়ি, কনডম হাতে ধরিয়ে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও অন্য বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছিল আমার নতুন মামি ও *সবুজ ছাতা*-র মহিলা কর্মীর মধ্যে।

নানির যে একদম সহ্য হচ্ছে না তা দরজায় দাড়িয়ে থাকা ওনার হাব-ভাব দেখেই বুঝতে পারলাম। মামির সঙ্গে সবুজ ছাতার মহিলা কর্মীর কথা বলাটা বিরাট অন্যায় যেন।

দেখ তো কাজল, বিয়ের কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই কই নিজের ছেলের বৌকে সংসারের ঝুটঝামেলাগুলো বুঝিয়ে দেবো, না, মহিলার সঙ্গে বৌয়ের অযথা গল্প করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়, তুই–ই বল?

ধমকের সুরে নানিকে বললাম, এ মহিলা কর্মীর সব কথায়ই ঠিক। এখন থেকে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সম্বন্ধে মামি সঠিক তথ্য না জানেন তাহলে সংসারে তিনি সুখী হতে পারবেন না।

তুই তো দেখছি সেই মহিলার মতোই কথা বলছিস। আমাদের সময়ে তো এসবের কোনো দরকার ছিল না।

তোমাদের সময়েও জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো ছিল, যা তোমরা ব্যবহার করতে শেখোনি। আর সবুজ ছাতার মহিলা কর্মীর মতো তোমাদের এই পদ্ধতির সম্বন্ধে ভালোভাবে বোঝায়নি। তাই আজ ছয় ছেলে, পাচ মেয়ের জননী তুমি। যদি পদ্ধতিগুলোর সঠিক ব্যবহার জানতে তাহলে এতো ছেলেমেয়ে হতো না। এখন মহিলার কথাগুলো তোমার সহ্য হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বন্ধুরা আমাকে বিদ্রূপ করে, তোর নানি কিভাবে তোর নানার দৈহিক অত্যাচার সহ্য করতো তা দেখার বড় সাধ জাগে এখন আমাদের। এ জন্য তোমার ছেলের বৌকে সবুজ ছাতা কর্মীর পরামর্শ মেনে চলতে বলো। এটা শাশুড়ি হিসেবে তোমার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তা না হলে তোমার মতো মামিও অধিক সন্তান উৎপাদন করবে। আর আমাদের গুণতে হবে মামা–খালার মতো মামাতো ভাইবোন।

নানি নীরবে উঠানে দাড়িয়ে মহিলা কর্মীর *সবুজ ছাতা* হাতে নিয়ে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ময়মনসিংহ থেকে

বৈ- লে সরদার

- - মন্টু চৌধুরী

শুয়রের পাল এসেছে রে! শুয়রের পাল এসেছে। বাড়ির বাইরে খড়ের গাদার আড়ালে একদল ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে মাঠের উত্তর দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। কারো হাতে পাটকাঠি, কারো হাতে বাশের লাঠি। আহা! খেজুরের ডগা দিয়ে শুয়র পেটানো যা আরাম! দৌড়া, দৌড়া।

স্কুলে যাওয়ার জন্য রুসি আর আমি কাপড় পরে তৈরি হচ্ছিলাম। ঘরের মধ্য থেকে চিৎকার শুনে জানালা দিয়ে দুইজনে বাইরে তাকিয়ে দেখি পাড়ার কাপড় পরা থেকে ল্যাংটো কিন্তু হাটতে পারে এমন সব ছেলেমেয়েরা লাঠিসোঠা হাতে দৌড়াচ্ছে। তাদের সকলের কেবল একটাই ইচ্ছে অন্তত কিছু

না হোক একটা শুয়রের পিঠে একটিবারের জন্য হলেও লাঠি দিয়ে একটা ঘা মারার। কৌতূহলী মা, চাচি, বোন, ভাবীরাও বাড়ির বেড়ার ফাক দিয়ে কুয়োতলার ঝোপের আড়াল থেকে পুকুর পাড়ের উচু জায়গা থেকে তাকিয়ে দেখছেন। মৃদু ঘোত ঘোত আর মাঝে মাঝে শুয়রে শুয়রে কামড়া–কামড়ির লম্বা চিৎকার। মা–চাচিরা হেসে কুটি কুটি হয়ে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছেন। আমরাই বা বাদ যাই কেমন করে? রুসি আর আমি হাত ধরাধরি করে দৌড় দেই শুয়রের পালের দিকে।

রুসি আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। একান্ত ভালোবাসার প্রিয়া। এদের বাড়িতে লজিং থেকে পাচ মাইল পথ পায়ে হেটে রুসি আর আমি লেখাপড়া করি। অনেক বন্ধু আমাদের দেখে ঈর্ষা করে। আমরা তা থোড়াই কেয়ার করি। আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র আর সে ক্লাস সেভেনের। লজিং থাকার বিনিময়ে তাকে পড়াতে হয়। সম্পর্কে তেমন কিছু না হলেও আমরা একে অন্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি।

আমার তেমন আকর্ষণ শুয়রের প্রতি নয় শুয়রের পালের রাখাল যাদেরকে আমাদের এলাকার লোকে বৈ–লে বলে ডাকে। কাধে ঝোলানো বিরাট ঝোলা, মাথার ওপর বাশের বাটওয়ালা গোলপাতার ছাউনি দেয়া বিশাল আকৃতির ছাতার প্রতি। রোদ, বৃষ্টি, বর্ষা–বাদল, শীত–বসন্ত সব ঋতুতেই ছাতা তাদের ঘর, তাদের আবাস। বাম হাতে হুকা, ডান হাত বাশের লাঠি, মাথার উপর ছাতা, কাধে ঝোলানো ঝোলা, গলায় বৈচি ফলের মোটা মোটা ভিমরি মালা। কালো কুচকুচে শরীরে নাদুস–নুদুস দেহ নিয়ে বনে–বাদাড়ে, জলে–স্থলে সব জায়গায় হিংস্র একপাল পশু নিয়ে নির্বিচারে চরিয়ে বেড়ায় তারা। এ দৃশ্য দেখতে বড়ই ভালো লাগে আমার। ভাদালি ঘাসের জমিতে মাটি খুড়ে ভাদালির বিচি খাওয়া, আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ভেজা কদম ফোটা প্রকৃতির গায়ে সকালের ঝলমলে রোদ পড়ে কচু বনের দুর্বা ঘাসে, দুরন্ত ভাদালি ঘাসের গায়ে যেন যৌবনের শাণিত তরবারির মতো চিকচিকে আলোর জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। শুয়রের পালে কচু পাতায় মুক্তোর দানা, মাটি খুড়ে গাট্টিগুলো খুটে খুটে খাচ্ছে। আর চাষীদের পড়ে থাকা জমিগুলো চাষ করে দিচ্ছে। রুসিকে ডেকে নিয়ে চলে গেলাম স্কুলে। যাওয়ার আগে বৈ–লে সরদারের থেকে জেনে গেলাম সন্ধ্যা বেলায় তারা কোনো মাঠে শুয়রের বাথান দেবে।

স্কুলের পড়ায় মন বসাতে পারিনি সেদিন। স্যারদের কানমলা আর বেতের বাড়ি খেয়েছি কয়েকবার। দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে স্কুলে গেলেও মন পড়েছিল বৈ–লেদের ছাতার দিকে। সরিষার তেল মাখিয়ে লাল টুক টুকে বাশের বাট, কচ্ছপের পিঠের মতো অপূর্ব কারুকাজ করা গোলপাতার ছাউনি, হাতে হুকা, কাধে ঝোলা, তার ভেতর একদল বৈ–লের একটা সংসার।

বিকেল বেলা। স্কুল থেকে ফিরে রুসিকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই শুয়রের পালের কাছে গেলাম। এবারের কৌতূহল, সন্ধ্যাবেলায় কিভাবে শুয়রের পালে বাথান দেয়। সরদারের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছি আমরা। কথার ফাকে জেনে নিলাম রাতে তারা ঘুমায় কিভাবে।

সবুজ পাতার পাটের জমির উত্তর দিকে, আখের জমির কোল ঘেষে, আউস ধানের সদ্য শীষ গজানো জমির পশ্চিম দিকে উচু টিলার মতো পরিত্যক্ত উলু ঘাসে ভরা বেলে মাটির জমিতে সরদার বাথান দেয়ার আয়োজন করতে লাগলো। জমির মাঝখানে সরদারের ছাতাখানি পুতে বিঘা দুই জমি বর্গাকারে বাশের লাঠি দিয়ে গোল দাগ দিতে দিতে মুখ দিয়ে ভু–উ–উ–উ–উ শব্দ করতে লাগলো। সঙ্গের বৈ–লেরা চারদিক থেকে গুছিয়ে এনে দাগের ভেতরের ছাতার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলো। শুয়রগুলো বিচিত্র স্বরে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে গিয়ে ছাতার চার পাশে পরস্পরের গা ঘেষে শুয়ে পড়তে লাগলো। পালের সব শুয়র যখন গোল হয়ে শুয়ে রইলো তখন একজন বৈ–লে সরদারের হাতের বিশেষ ধরনের লাঠিটি নিয়ে ছাতার জায়গায় পুতে ছাতাটা উঠিয়ে নিয়ে এলো।

রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসেও পড়ায় মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমার কানের কাছে মুখ এনে রুসি ফিশ ফিশিয়ে বললো, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে বাথানে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

আমার মন পড়ে রয়েছে বাথানে। ছাতার নিচে, খোলা মাঠে তারা কিভাবে ঘুমায় দেখার জন্য অস্থির আমি। রুসির কথায় সম্মতি জানিয়ে খেয়ে দেয়ে নিজের শোয়ার ঘরে চলে আসি। চোখে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। রুসির ডাকে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দশটা। গ্রামবাংলায় রাত দশটা মানে নিশীথ রাত। চাদ উঠেছে আকাশে, ভরা পূর্ণিমা না হলেও পরিপূর্ণ চাদ। আষাঢ়ের রাতে ঝির ঝির ইলশে গুড়ি বৃষ্টির সঙ্গে চাদে মেঘের কোলাকুলি, বৃষ্টি আর বিজলির ঢলাঢলি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, চোখে না দেখলে বর্ণনায় বোঝানো যাবে না। উজ্জ্বল চাদটাকে যখন আষাঢ়ের হালকা মেঘে ঢেকে ফেলছে তখন চাদের আলো প্রকৃতির ওপরে ফেলছে সুরমার মতো জ্যোৎস্না।

ছাতা মাথায় রুসি আমার দরজায়। বললাম, চলো। এই প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গে পথ চলা। নিশীথ রাতে একটি ছাতার নিচে কিশোরী একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হেটে যাওয়া, খুশিতে উত্তেজনায়, আবেগাপ্লুত আমি। এক মুঠো স্তনে হাত রেখে কয়েকটা চুমু দিলাম তাকে। সে বাধা দিল না। ঝির ঝির বৃষ্টির ছিটায় ভিজছি দুইজনে। তবু চলছি নিশীথে পাওয়া পথিকের মতো। ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই, দুইজনের দুটি দেহ জড়িয়ে কখনো কাধে কাধ রেখে চলছি তো চলছিই। কখন যে বাথানের কাছে এসে গেছি টের পাইনি।

বাবারে! উহু, কিসে যেন কামড়িয়ে দিয়েছে। নীল বেদনায় ককিয়ে উঠে আমার গায়ের ওপর রুসি ঢলে পড়লো। তার হাতে ধরা ছাতাটা কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঝর ঝর বৃষ্টির ফোটায় আমাদের শরীর ভিজে পানি চুইয়ে পড়তে লাগলো। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা গোখরো সাপ তার উদ্যত ফনা নামাতে নামাতে সড় সড় করে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল। আমার বুঝতে বাকি রইলো না ঘটনাটা কি ঘটে গেল।

রুসিকে কোলে তুলে বৈ-লে সরদারের ছাতার কাছে বসিয়ে ঘুমন্ত সরদারকে জাগিয়ে তুললাম। দুই হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আমাদের দিকে কৌতূহলী প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, কি হয়েছে তোমাদের?

রুসিকে গোখরো সাপে কামড় দিয়েছে।

সরদার ত্বরিত বেগে তার সঙ্গীদের জাগিয়ে তুললেন। হারিকেন এনে ছাতার নিচে সরদারের বিছানায় রুসিকে বসিয়ে তার পিঠের দিকে বসে খাড়া করে ধরে রাখতে বললো। পায়ের কাছে হারিকেন ধরে ক্ষতটা পরীক্ষা করে ছুরি দিয়ে ক্ষতস্থান ফেড়ে ফেলে হাটুর উপরে বাধন এটে দিল সদরকার। ঝোলা থেকে কয়েক রকমের গাছের শেকড় বের করে চিবিয়ে খেতে বললো রুসিকে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু রুসি চিবিয়ে খেতে লাগলো পান খাওয়ার মতো আয়েশ করে। এগুলো খাওয়া শেষ হলে আরো বের করে দেয়। আবার খেতে থাকে কচ কচ করে।

সরদারের কয়েকজন লোক রুসির পায়ে পাটের শুকনো আশ বেধে হাটুতে বাধা বাধনের নিচে থেকে মাংস চিপতে থাকে আর ক্ষতস্থান থেকে পাটের আশ বেয়ে রক্ত চোয়াতে থাকে। এভাবে দুই ঘণ্টা চিকিৎসা চলার পর সরদারের দেয়া গাছের শেকড় রুসি খেতে চাইলো না। জিজ্ঞাসা করাতে মুখ বাকিয়ে জানালো, সেগুলো এখন তেতো লাগছে।

বিজয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলো বৈ-লে সরদারের মুখায়বে। হুকাটা হাতে নিয়ে আগুন দিয়ে টানতে টানতে সঙ্গীদের একজনকে নির্দেশ দিল এক ঘটি দুধ গরম করে আনতে।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু ভাব কেটে গেছে রুসির চোখ থেকে। মেঘে ঢাকা চাদের আলোয় দেখলাম রুসির মুখচ্ছবিকে। অপূর্ব! উদ্ভাসিত। আনন্দময়। জীবন ফিরে পাবার লাজুক আনন্দে কৃতজ্ঞতাময় চাওনি। সুরমার মতো জ্যোস্নার আলো লেগে মোহময় করে তুলেছে তাকে।

সরদারের দেয়া এক ঘটি গরম দুধ তাকে পান করলাম নিজ হাতে। জানি না দুধটুকু কিসের ছিল। জানতেও ইচ্ছা হলো না তখন। পরাণ প্রিয়ার জীবন বাচানোর কৃতজ্ঞতায় সারা জীবনের জন্য সরদার আমাকে বেধে ফেললো।

মৃদু হেসে সরদার আমাকে বললো, খোকন, তোমরা এখন বাড়ি ফিরে যাও। খুকি এখন বিষমুক্ত। কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজন। আজকের এই ঘটনার কথা বাড়ির কাউকে যেন বলো না। পায়ের কাটা দাগের কথা জানতে চাইলে কিছু একটা বানিয়ে বলো, তাতে পাপ হবে না।

রুসিকে ঘাড়ে চড়িয়ে চুপি চুপি তার ঘরে পৌছে দিয়ে নিজের ঘরে সারা রাত ছটফটিয়ে ঘুমহীন কাটিয়ে দিই। ঘটনাটা আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগের। সেই থেকে রুসি আমার ঘাড়ে চড়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়ায়।

চাচড়া, যশোর থেকে

অভিশপ্ত

- - মাহতাব উদ্দিন

কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত দীর্ঘ খরা। মাঝে মধ্যে হয়তো কখনো এক আধপশলা বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ছাতাটা ব্যবহার করা হয়নি। প্রায় ছয় মাস ঘরের বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। বর্ষা না এলে এটা ব্যবহার হয় না। ছাতা একটা বোঝা মনে হয়। তাছাড়া ছাতা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। তাই ছাতাটা সহজে কেউ ব্যবহার করতে চায় না। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী শুরু হলে নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে অগত্যা ছাতার শরণাপন্ন হতেই হয়।

অনেক দিন পর ভাইয়া আর ভাবী এসেছেন ঢাকা থেকে। শহরে স্থায়ী হওয়ার আগে ভাইয়া আমাদের গ্রামে একটা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কমিটির চেয়ারম্যান এসে ভাইয়াকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন স্কুলে চা খেয়ে একটু দেখে আসতে। সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে ভেবে ভাইয়া সময় দিলেন সকাল এগারোটায়।

স্কুলে রওনা করার কিছুক্ষণ আগে থেকেই আকাশে মেঘ করতে শুরু করলো। মা তখন ছাতাটা নিয়ে বের হতে বললেন। ভাইয়া ছাতাটা নিয়ে আসতে বললো ভাবীকে। ভাবী ঘরের মাঝের কোঠায় যেখানে চাল ডালের ডোলা রাখা হয় তার বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো ছাতাটা নিয়ে এলেন উঠানে। ছাতাটায় ঝুলকালি জড়িয়ে আছে দেখে একটু ঝাড়া দিতেই ছাতার ভেতর থেকে চার পাচটা তেলাপোকা উড়ে এসে ভাবীর শরীরে বসলো।

ভাবী নিতান্তই শহুরে মেয়ে। তাছাড়া তেলাপোকায় তার ভীষণ ভয়। তেলাপোকা দেখে তিনি তো জ্ঞান হারানোর অবস্থা। তাও চার পাচটা একদম গায়ে এসে পড়েছে এবং কর্কশ পাগুলো দিয়ে হেটে বেড়াচ্ছে। সেগুলোকে কি করে তাড়াতে হবে অথবা পালিয়ে বাচা যাবে কি না সেটা ভেবে পেলেন না।

তবু প্রথমে দৌড় দিলেন। উঠানময় দৌড়াচ্ছেন আর বিচরণকারী তেলাপোকার অনুসন্ধানে অসম্ভব অসম্ভব স্থানে হাত নিতে চেষ্টা করছেন।

তার কাণ্ড দেখে আমরা সবাই হেসেই অস্থির। ছুড়ে মারা ছাতার মধ্য থেকে আরো দুই একটা তেলাপোকা বেরিয়ে যখন পাখা মেলছে তখন সে এমন একটা ভঙ্গি করছে যেন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখে তো আমরা হেসেই খুন। কিন্তু হঠাৎ হাসি বন্ধ হয়ে গেল সকলের। ছোটাছুটি করতে গিয়ে শাড়ি পায়ে জড়িয়ে ভাবী ধপাস করে পড়ে গেলেন উঠানের মাটিতে। তারপর গড়িয়ে চলেছে উঠানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। উঠানে ছড়িয়ে থাকা মুরগির পায়খানা, ছাই, ছাগলের পায়খানা এবং মাটি মেখে তাকে আর এখন চেনা যায় না। ভাবী আতঙ্কে এবং ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছেন। গড়াতে গড়াতে উঠানের এক প্রান্তে চলে গেছে। সেখানে মাটির মধ্যে ভাঙা কাচের টুকরো ছিল। তার পিঠের অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলো।

মা ঘরের মধ্যে থেকে হই চই শুনে ছুটে এসে এ অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে তুললেন। মায়ের বুকের মধ্যে দাড়িয়ে থেকে ভাবী বলতে থাকেন, মা তেলাপোকা ছাড়িয়ে দিন।

মা তন্ন তন্ন করে খুজেও তার গায়ে কোনো তেলাপোকা পেলেন না। বেচারা তেলাপোকা কখন পালিয়েছে সেদিকে ভাবীর খেয়াল নেই। মা বললেন, তেলাপোকা নেই। চলো ঘরে বসবে।

তাকে বসানোর পর আমি ডেটল, তুলো নিয়ে এলাম কাটা জায়গায় লাগাবো বলে। কিন্তু ভাবী আমার ওপর এবং ভাইয়ার ওপর রেগে আগুন।

আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে আসবে না।

বললাম, আমার অপরাধ?

বললেন, আমি বিপদে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছি আর তোমরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে হাসছো। কোনো সাহায্য করছো না। আবার অপরাধ জানতে চাও।

মাও বকতে শুরু করলেন। আমার যতো ক্ষোভ সৃষ্টি হলো ছাতাটার ওপর। রাগে যখন গর গর করে বেরিয়ে যাচ্ছি ছাতাটার বিচার করতে তখন চোখে পড়লো ভাবীর নাকের ওপর মুরগির পায়খানা লেগে আছে। গালে লেগে আছে ছাই, মাটি। হাসিটা আবার পেয়ে বসলো। বললাম, আমাদেরকে দোষ দিচ্ছো কেন? তুমি যে মুরগির পায়খানা অতো পছন্দ করো তা কি আমরা জানতাম? সকালবেলা তেলাপোকার ছুতো দিয়ে নাকে কপালে চন্দনের ফোটার মতো মুরগির পায়খানা মেখে বসে আছো আর আমাকে ধমকাচ্ছো।

ভাবী ওয়াক করে বমি করে ফেললেন। মা তাকে পুকুরঘাটে নিয়ে ঘটি ঘটি পানি ঢেলে বার বার সাবান লাগিয়ে গোসল করালেন। ছাতাটা নিয়ে স্কুলে ছুটলাম খবর দিতে যে, ভাইয়া আজ আসবেন না, আগামীকাল আসবে।

খবরটা পৌছে ফিরছি। রাস্তায় একদল মোষ। চর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে খালের লতাপাতা খাওয়াতে। ফোটাফোটা বৃষ্টি পড়ছে। ছাতাটা মেলে ধরে হন হন করে হাটছি। হঠাৎ একটা মোষ খেপে উঠলো। ছুটে এসে ছাতাসহ আমাকে শিংয়ের ধাক্কায় খালে ফেলে দিল। রাখালটি ছুটে এসে বললো, ছাতা ফেলে দেন। কিন্তু ততোক্ষণে আমি খালের মাঝে চিৎপাত। ছাতাটা একটু দূরে। মহিষটা চরম আক্রোশে ছাতাটাকে ফালা ফালা করছে। রাখাল দৌড়ে এসে আমাকে ধরে উঠালো। বাম হাতের অনেকটা জায়গা কেটে রক্ত পড়ছে। হাটতেও সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।

আমাকে ফার্মাসিতে নিয়ে গেল। তারা ওষুধ দিয়ে হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিল। তারপর ভিজা কাপড়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে বাড়ি পৌছে দেখি ভাবী ক্লান্ত, বিষণ্ন হয়ে একটা বাসি গন্ধরাজ ফুলের মতো সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। আমার ভেজা কাপড় ও হাতে ব্যান্ডেজ দেখে দ্রুত উঠে ডাকলেন, মা দেখুন সাবুর কি হয়েছে এবং তিনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে।

এ অবস্থায়ও আমার হাসি পাচ্ছে। বললাম, তোমার অভিশাপ লেগেছে। মোষে গুতিয়ে হাত ভেঙেছে।

ভাবী হাউমাউ করে উঠলো এবং বললেন, নারে তোকে আমি অভিশাপ দিইনি।

তার চোখে পানি। মাও এসে পড়েছেন। আমি আবার হেসে ফেললাম। বললাম, অভিশাপ দাও আর যাই দাও, যে নাচ দেখালে তা জীবনে ভুলতে পারবো না।

ভাবী হেসে ফেললেন, আস্তে করে দুই তিনটা চড় দিয়ে বললেন, অলক্ষুণে ছাতাটা কোথায়?

বললাম, ওটা কি আর বাড়িতে আনি? ফেলে এসেছি খালে। পাগলা মহিষটা ওটা ছিড়ে ছুড়ে মাটিতে পুতে দিয়েছে।

ভাবী শুনে যেন তৃপ্তি পেলো। তার পক্ষ থেকেই হয়তো মহিষটা এ কাজ সুসম্পন্ন করেছে। বললো, বেশ হয়েছে।

বালিগ্রাম, বরিশাল থেকে

কচুর পাতা

গৌতম কুমার রায়

সবেমাত্র প্রাথমিক স্কুল পাস করে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছি। প্রাথমিক স্কুল ছিল বাড়ির পাশেই। আর মাধ্যমিক স্কুল ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় পাচ কিলোমিটার দূরে। গ্রামের স্কুল। প্রায় সকল শিক্ষক ও ছাত্র রোদ–বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করতো। শুকনোর সময় ছাতা না থাকলেও চলে। কিন্তু বর্ষাকালে ছাতা না হলে বাড়ির বাইরে বের হওয়া কষ্টকর। তাছাড়া গ্রামে এমন বাড়ি খুবই কম আছে যে বাড়িতে একটা ছাতা নেই।

পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় ছাতা কেনার মতো সামর্থ আমাদের ছিল না। আমার পড়ার সাথীদের প্রায় সকলের ছাতা ছিল। কেবল আমার মতো হাতে গোনা কয়েকজনের ছাতা ছিল না। আমাদের আর্থিক অবস্থা এতো খারাপ ছিল জেনেও বাবার কাছে ছাতা কেনার কথা বলতেই বললেন, টাকা পাবো কোথায়?

কষ্ট হলেও আর কোনোদিন বাবার কাছে ছাতা কেনার কথা বলিনি।

শুকনো মরসুম শেষে বর্ষা মরসুম এসে গেল। ছাতা না থাকার দরুন বইগুলো পলিথিন ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নিজে ভিজতে ভিজতে স্কুলে যেতাম। কোনো কোনোদিন অন্যের ছাতার মধ্যে যেতাম। এদিকে স্কুলে গিয়ে প্রথম ক্লাস ধরতে না পারলে সেদিন অনুপস্থিত। হাজিরা খাতায় আর নাম উঠতো না। এরপর দিন দরখাস্ত না নিয়ে গেলে খেতে হতো বেদম প্রহার। তাই কষ্ট হলেও ভিজতে ভিজতে গিয়ে চেষ্টা করতাম প্রথম ক্লাস ধরার জন্য।

একদিন সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কি করা যায়, কিভাবে স্কুলে যাবো ভাবতে লাগলাম। মনে মনে রাগও হচ্ছে আবার কষ্টও হচ্ছে। কিন্তু কি করবো, বাপের টাকা নেই। সকালের খাওয়া শেষ করে এমন অনেক কিছুই ভাবতে লাগলাম। বৃষ্টি তখন প্রায় থেমে যাবে যাবে ভাব। এদিকে আবার প্রথম ক্লাস ধরতে হবে।

আমাকে মনমরাভাবে বসে থাকতে দেখে মা বললেন, এক কাজ কর। বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে, বড় কচুর পাতা মাথায় দিয়ে যা, যেতে যেতে বৃষ্টি থেমে যাবে।

ভাবলাম উপায়টা খুব ভালো। মাকে বললাম একটা কচুর পাতা এনে দিতে।

মা একটা মান কচুর বড় পাতা কেটে এনে আমাকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মাথার ওপর ধরতে হবে। আমি মায়ের কথা মতো পাতাটা নিয়ে বইয়ের ব্যাগটা এক বগলে করে ঠিক মা যেভাবে দেখিয়ে দিলেন ঠিক সেভাবেই কচুর পাতাটা মাথার ওপর দিয়ে স্কুলে গেলাম।

তারপর থেকে প্রতি বৃষ্টির দিনে ছাতার পরিবর্তে মানকচুর বড় পাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যেতাম। আমি যখন ক্লাস নাইনে উঠি তখন আমার পড়ার ভাব দেখে অনেক কষ্ট করে বাবা আমাকে একটা ছাতা কিনে দিলেন।

সেই থেকে আমি কচুর চেয়ে কচুর পাতাকে বেশি ভালোবাসি। কারণ আমার শিক্ষা জীবনের তিন তিনটি বছর ছাতার বিকল্প হিসেবে কচুর পাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে।

দাপোক, খুলনা থেকে

শিল্পমেলা ও চিড়িয়াখানা

মোহাম্মদ জর্জিস হোসেন নুনু

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকের কথা। বগুড়া রেল স্টেশনে একটা অদ্ভুত শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশটি বগি সংবলিত এক বিশাল রেল গাড়িটিই ছিল প্রদর্শনীর স্থান। প্রতিটি কমপার্টমেন্টে এক একটি কম্পানি তাদের নিজের তৈরি পণ্য সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে গোটা রেল গাড়িটিকে এক মনোমুগ্ধকর দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করেছিল। বিনা টিকেটে এই সুন্দর শিল্পমেলা প্রদর্শন এবং আকর্ষণীয় দামের পণ্য কেনার সুযোগ থাকায় প্রচণ্ড ভিড় থাকতো সর্বক্ষণ।

এই প্রদর্শনীয় বগিগুলোর মধ্যে সাজ-সজ্জায় *তিব্বত কোং* বগিটি ছিল সবচেয়ে দর্শনীয়। আর সবচেয়ে আকর্ষণহীন ছিল *রেলি ব্রাদার্স* কম্পানির ছাতার বগিটা।

প্রতিদিন রোদ বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম। তাই একটা ছাতার অভাব সব সময় অনুভব করতাম। একদিন রেলি ব্রাদার্সের বগিতে উঠে একটা ছাতা পছন্দ করলাম। দাম আট টাকা। পরদিন আব্বার কাছে ছাতার জন্য আবদার করলাম।

আব্বা তেমন কোনো আপত্তি করলেন না। প্রায় চাওয়া মাত্রই আটটি টাকা দিলেন।

বিকেল বেলায় আমার এক সমবয়সী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ছাতা কেনার জন্য। বন্ধুটি শুধু বন্ধু নয়, আত্মীয়তারও সম্পর্ক ছিল। বন্ধুটির পিতা একজন আইন ব্যবসায়ী। ছাতা কেনার জন্য দুই বন্ধু মিলে রেলি ব্রাদার্সের বগিতে উঠলাম। কিন্তু দেখা গেল উক্ত আকর্ষণহীন বগিটিতেও প্রচণ্ড ভিড়। নিয়ম ছিল, এক দরজা দিয়ে উঠতে হবে, অপর দরজা দিয়ে নামতে হবে। বন্ধুটিকে সামনে দিয়ে তার পিছু পিছু ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম কাঙ্ক্ষিত ছাতাটির দিকে। তখনকার দিনে শার্টের বুক পকেটটের সঙ্গে একটা গোপন পকেট থাকতো যাকে ঘড়ি পকেট বলা হতো। এই পকেটে আটটি টাকা অতি যত্নের সঙ্গে রেখেছিলাম। এক সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, পেছন থেকে একটা হাত আমার

ঘড়ি পকেটে দুটি আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে টাকাগুলোর কিছু অংশ বের করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতখানা শক্ত করে ধরলাম এবং *পকেটমার* বলে চিৎকার শুরু করলাম।

কিন্তু শেষটায় আমাকেই চোর সাজতে হলো। আমি নাকি মহাঅন্যায় করে ফেলেছি। অমন একটি শিল্পকর্মে বিঘ্ন ঘটিয়েছি এটা কি কম অন্যায়! মানি লোকের মান নষ্ট করেছি। এক রত্তি স্কুল ছাত্র হয়ে একজন কলেজ ছাত্রকে পকেটমার বলেছি এটা কি যেমন তেমন বেয়াদবি! শাস্তি তো পেতেই হবে।

তাদের সবার পরনে ছিল লুঙ্গি। এরা সংখ্যায় প্রায় দশ বারোজন। চেহারায় ছাত্র না বলে ছাত্রের বাবা বললে হয়তো মানানসই হতো। আমাকে তারা টেনে হেচড়ে গাড়ি থেকে ফুটপাথে নামাতে চেষ্টা করলো। হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি, গাড়ির দরজা বরাবর ফুটপাথে দাড়ানো আমার একজন অতি পরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমার বন্ধুর আইন ব্যবসায়ী পিতার মুহুরি। ভদ্রলোক বলিষ্ঠ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। আমার এমন বেহাল অবস্থা দেখে তিনি এগিয়ে এলেন এবং ঘটনা জানতে চাইলেন।

এরা পকেটমার কথাটুকু আমার মুখ থেকে শোনার পর আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না। হুঙ্কার দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন পকেটমারের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে জনতার কিল-ঘুষিতে পকেটমারটি জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। আর এই সুযোগে তার সঙ্গীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাচলো। এদিকে জিআরপি-র লোকেরা এসে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা পকেটমারটিকে তুলে নিয়ে গেল। এরপর মুহুরিকে সঙ্গে নিয়ে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ছাতাটা কিনলাম।

দুই.

এ ঘটনার দুই এক বছর আগের ঘটনা। বগুড়ার নবাববাড়ীতে তখন একটা ছোট চিড়িয়াখানা ছিল। বর্তমানে সেখানে দুটি শপিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। সে যাই হোক। এই চিড়িয়াখানায় একদিন বন থেকে সদ্য ধরে আনা একটা নতুন বাঘ ঠাই পেল। নতুন বাঘটিকে দেখার জন্য সব সময় লোকজনের ভিড় থাকতো। আমরা প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময় একবার এবং স্কুল ছুটির পর একবার সেই বাঘটিকে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতাম। এই নিয়মিত বাঘ দর্শন আমাদের এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

সেদিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। এখনকার মতো তখনো বৃহস্পতিবারে হাফ স্কুল হতো। স্কুল ছুটির পর অভ্যাস মতো বাঘের খাচার সামনে গিয়ে দাড়ালাম। ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘটি খাচার এক কোণে শুয়েছিল। একজন বয়স্ক গ্রাম্য ভদ্রলোক ছাতা হাতে বাঘ দর্শনে মগ্ন ছিলেন। ভদ্রলোক ছাতাটি যে

একটু আগে কিনেছেন তা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। কেননা খাকি রঙের কাগজে ছাতাটা তখনো মোড়ানো ছিল। কি যেন ভেবে ভদ্রলোক ছাতার অর্ধাংশ খাচার শিক-এর ফাক দিয়ে ঢুকে দিয়ে খট খট শব্দ করে বাঘটির ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করলেন।

কোনো কিছু ভাবার আগেই বাঘটি গুরুগম্ভীর গর্জন করে ঝাপিয়ে পড়লো ছাতাটির ওপর। এরপর শুরু হলো বাঘে-মানুষে ছাতা টানাটানি। সব কিছুই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর দেখা গেল, ভদ্রলোকটির হাতে শুধু ছাতার বাটখানা এবং বাঘের থাবায় ছাতার ছিন্ন ভিন্ন বাকা অংশটুকু। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই হতবাক। হতবিহ্বল ভদ্রলোকটি ছাতার বাট হাতে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে বাঘের থাবার দিকে তাকিয়ে থাকার পর স্থান ত্যাগ করলেন।

বগুড়া থেকে

কাছা

– – হাসান মীর

বাংলায় কাছা শব্দের অর্থ ধুতি বা শাড়ির যে অংশ দুই পায়ের ফাক দিয়ে কোমরের পেছনে গোজা হয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের মেয়েরা কাছা দিয়ে শাড়ি পরে। তবে জাপানি ভাষায় কাছা (Kasa) শব্দের অর্থ ছাতা। জাপানে সারা বছরই কম বেশি বৃষ্টি হয়। তাই বৃষ্টিপাত হোক আর তুষারপাত, কাছা বা ছাতা হচ্ছে জাপানি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জাপানের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলো প্রায় নিয়মিতভাবে নানান বিষয়ের উপর জনমত জরিপ ও তথ্য উপাত্তের ফলাফল প্রকাশ করে থাকে। একবার এমনি একটা জরিপে বলা হলো, বিশ্বে মাথাপিছু ছাতা ব্যবহারের দিক থেকে জাপানিরাই নাকি প্রথম। গড়ে প্রত্যেক জাপানি নারী-পুরুষের তিনটি করে ছাতা থাকে। রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগে চাকরি উপলক্ষে সাড়ে তিন বছরে না হোক ছাতা কেনার ক্ষেত্রে অন্তত জাপানিদের টেক্কা দিতে পেরেছি বলে মনে হয়। তাদের জন্য যা ছিল প্রয়োজন তা আমার জন্য ছিল অনেকটা শখের ব্যাপার।

জাপানের আবহাওয়া দফতর আমাদের ঢাকা আবহাওয়া অফিসের মতো নয়। ঝড়, বৃষ্টি, টাইফুন ও তুষারপাতের ক্ষেত্রে তারা শতকরা ৯৯ ভাগ সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। ফলে চাকরিজীবী হোক আর শিক্ষার্থী সকলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে অবশ্যই টিভি-রেডিও-তে দিনের পূর্বাভাস শুনেই পথে নামে। একে তো জাপানি ভাষায় দখল নেই, তার উপর সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোয়া

কিংবা শেভ করার মতোই আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনাও যে জরুরি এমন ধারণাও ছিল না। ফলে অনেকদিনই অফিস শেষে বাসায় ফেরার সময় বিপাকে পড়তাম।

এ রকম ক্ষেত্রে বিচক্ষণ জাপানিরা অবশ্য খুব অল্প দামের ডিজপোজেবল ধরনের প্লাস্টিকের ছাতা কেনে। বৃষ্টি থেমে গেলে এ ধরনের ছাতা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নেয়ার গরজ থাকে না, ট্রেনের কামরায় কিংবা স্টেশনে ফেলে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার আদেখলেপনা স্বভাবের কারণে (তাছাড়া সারাক্ষণ পকেটে পয়সাও থাকতো) এনএইচকে (রেডিও জাপানের পরিচালনা প্রতিষ্ঠান) ভবনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিংবা রেল স্টেশনের দোকান থেকে দেখেশুনে পছন্দসই ছাতাই কিনতাম। এভাবে একে একে আমার সংগ্রহে ডজনখানেক ছাতা জমেছিল। দেশে ফেরার সময় যখন সমুদ্রপথে অন্য সব জিনিস পাঠাই তখন সাতটি ছাতাও পাঠিয়েছিলাম। এর সঙ্গে অবশ্য একটা ফৃ পাওয়া ছাতাও ছিল এবং সেই ছাতাটির গল্প বলতেই এতো কথার অবতারণা।

এক সময় আল–মামুন নামে স্বাস্থ্যবান সুদর্শন এক ভদ্রলোক টেলিভিশনে নাটক এবং ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিংবা আলাপ–পরিচয় ছিল না। কেবল চেহারায় চিনতাম। আমাদের অফিসের কাছেই *ইয়োইয়োগি* পার্ক। রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে শৌখিন ব্যান্ডদল সেখানে গান–বাজনার আসর বসায়, পুরনো জিনিসপত্রের অস্থায়ী বাজার বসে। এমনি এক ছুটির দিনে সেই গান–বাজনার আসরে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে আল–মামুন সাহেবকে দেখেই চিনতে পারলাম। এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং যতোদূর মনে পড়ে শিণ্ডয়া *স্টেশনের* কাছে *রয়াল বেঙ্গল* রেস্টুরেন্টে বসে সবাই একসঙ্গে চা খেলাম। এই রেস্টুরেন্ট চালাতেন শিউলি নাকাগাওয়া নামে এক বাঙালি মহিলা যার স্বামী জাপানি। এখন বোধহয় উঠে গেছে।

আমার বাসা ইয়োকোহামা এলাকায় এবং বেশ কিছুদিন থেকে জাপানে আছি শুনে মামুন সাহেব আলাপচারিতার এক পর্যায়ে *কামাকুরা* সম্পর্ক আগ্রহ প্রকাশ করলেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামাকুরা ভিত্তিক সামন্ত শাসকেরা প্রায় দেড়শ বছর ধরে গোটা জাপান শাসন করেছে। স্থানটি একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র এবং সেখানে বেশ কিছু দর্শনীয় মন্দির ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল একটি বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। আমি তিনবার কামাকুরা গেছি এবং আমার মুখে বর্ণনা শুনে মামুন সাহেব স্থানটি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কামাকুরা বাস্তবিকই এমন একটি স্থান যেখানে বার বার যেতে ইচ্ছা হয়। তাকে সঙ্গে নিয়ে পরের রবিবার কামাকুরা বেড়াতে গেলাম।

সকালের দিকে আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল। আমরা স্টেশনের কাছাকাছি দুটি মন্দির দেখার পর *দাবইবুতসু* বা বিশাল বুদ্ধকে দেখার জন্য বাসে চেপে *কোতোকুইন* মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাবার কথা

ভাবছি এর মধ্যে হালকা বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে ঝর ঝর করে ঠিক তুষারপাত নয়, বরং কাকর দানার মতো বরফের টুকরো পড়তে শুরু করলো। আমরা বাসস্ট্যান্ড থেকে দৌড়ে রেল স্টেশনের সামনে ফিরে এলাম। আমাদের অবস্থা দেখে স্টেশনের একজন কর্মচারী দুটো পুরনো ছাতা এনে এগিয়ে দিল। অনেক সময় যাত্রীরা ভুল করে ছাতা বা এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস ফেলে গেলে স্টেশনের কর্মচারীরা সেগুলো তুলে রাখে। এ রকমই দুটো ছাতা আমাদের দেয়া হলো। এর একটা কম দামি ডিজপোজেবল ধরনের প্লাস্টিকের এবং অন্যটি আকারে ছোট হলেও কাঠের হাতলযুক্ত চমৎকার পৃন্টের কাপড়ের।

ফেরার পথে আমরাও কম দামি ছাতাটি স্টেশনে ফেলে এলাম। কিন্তু অন্যটি আমার এতোই পছন্দ হয়েছিল যে ফেলে আসতে মন চাইলো না। বাসায় নিয়ে এলাম এবং শেষ পর্যন্ত আরো কয়েকটি ছাতার সঙ্গে সেটিও রাজশাহী এসে পৌছালো। মজার কথা, বাড়িতে অনেকগুলো ছাতার মধ্যে এই ছোট অথচ সুন্দর ছাতাটি আমার কনিষ্ঠপুত্রের পছন্দ হলো বৃষ্টির মধ্যে দোকানে কিংবা বড় রাস্তায় রিকশা ডাকতে গেলে এই ছাতাটিই হাতে নিয়ে বের হয়।

এর মধ্যে একদিন সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের অফিসের ড্রাইভার মোস্তফা বৃষ্টি মাথায় এসে বললো, রাস্তায় পানি জমে গেছে, বাড়ির সামনে গাড়ি আনা যাবে না, আমি যেন কষ্ট করে বড় রাস্তায় গিয়ে গাড়িতে উঠি।

দরজায় দাড়িয়ে দেখলাম মোস্তফা বৃষ্টিতে ভিজছে, তার সঙ্গে ছাতা নেই। আমি হাত বাড়িয়ে কামাকুরা থেকে কুড়িয়ে আনা সেই সুদৃশ্য ছাতাটি তাকে দিয়ে বললাম, বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ বাধাবে নাকি? এটা নিয়ে যাও।

এরপর সপ্তাহ চলে গেল। কিন্তু মোস্তফা আর ছাতাটি ফেরত দেয় না। শেষে একদিন দ্বিধা সঙ্কোচ এড়িয়ে বললাম, কি মোস্তফা, ছাতাটি ফেরত দিলে না?

মোস্তফা একগাল হেসে বললো, ওহ, সেই ছাতা! আর বলবেন না স্যার, গাড়ির মধ্যেই রেখেছিলাম কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। যদি বলেন তো স্যার একটা কিনে দেবো।

বাধা দিয়ে বলি, থাক, থাক, কিনে দিতে হবে না, ভারী তো একটা পুরনো ছাতা। বললাম বটে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফেলে আসা দিনের কিছু স্মৃতি জড়িয়ে ছিল এই ছাতাটির সঙ্গে।

দুঃখ করেই বা কি লাভ! একমাত্র স্মৃতি ছাড়া কিছুই তো চিরস্থায়ী হয় না। আমার ষাট বছরের এই জীবন থেকেও এভাবে কতো জিনিস, কতো চেনা-জানা মুখ চিরতরে হারিয়ে গেছে। এ তুলনায় সামান্য একটা ছাতা কিইবা এমন গুরুত্ব বহন করে!

রাজশাহী থেকে

গিফট

লাকী আলম

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের দিনের কথা। আমরা সকলেই গিফট দেখতে বসলাম। একটা একটা করে খুলছি আবার প্যাকেট করে রেখে দিচ্ছি। হঠাৎ দাদা হা হা করে হেসে উঠলেন। তাকিয়ে দেখি তার হাতে একটা ছাতা। সকলেই অবাক হয়ে মুচকি মুচকি হাসছি। মনে মনে বলতেও শুরু করে দিলাম, এটা কেমন গিফট। কিন্তু ছাতাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়, ব্র্যান্ড নেম খুজতে শুরু করলাম কোথাও নেই।

গিফটা ভিন্ন রকম। তাই সকলেই এটা নিয়ে রহস্য করছে। আমার বড় কুটুম ছাতা খুলে নাচতে শুরু করলো। সকলে জোর গলায় বলছে এই পল্লব, দেখ, ছাতার সঙ্গে একটা কাগজ ঝুলছে। সবার চোখ এখন কাগজটার দিকে। এতে লেখা *আবে ওই মাহবুব, আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম তোর ঘটকালী না করতে পারলে একটা ছাতা গিফট দেবো। দেখেছিস, কথাটা ঠিকই রেখে দিলাম।*

মাদারীপুর থেকে

ফায়ার প্লেসের পাশে

--ডা. সাদমান

স্কুলে যখন আমি নিচের ক্লাসের ছাত্র ছিলাম তখন খুব শখ ছিল একটি ছাতা কিনবো। আমাদের সময় ছোট আকারের রঙিন ছাতা পাওয়া যেতো যা ছোটদের খুবই প্রিয় ছিল। সে রকম একটি রঙিন ছাতা কেনার আবদার নিয়ে যখন বাবার দরবারে হাজির হলাম তখন আমার প্রাণপ্রিয় কিপটে আব্বার হুঙ্কার শুনে আমার আত্মারাম খাচা থেকে বের হবার যোগাড়।

তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম জীবনে কোনোদিন ছাতা কেনার চিন্তা মাথায় আনবো না। তাই শত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও ছাতা নামক এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটির অভাব জীবনে আর বোধ করিনি। ঘোর বৃষ্টি বাদল সত্ত্বেও যেভাবেই হোক স্কুলে যথা সময়ে হাজির হতে পেরেছি। কখনো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে, কখনো বা আধা ভিজে কখনো বা অমুকের কাছারি ঘরের ছালার নিচে, তমুকের গোয়াল ঘরের পাশে যাত্রা বিরতি করে কুকুর দৌড় দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করেছি। ছাতা না থাকার কারণে একদিন আমার জীবনে ঘটে গেল স্মরণীয় এক ঘটনা নাকি দুর্ঘটনা, বলা যায়, আমার জীবনের একমাত্র স্মরণীয় ঘটনা যা আজো আমাকে আগুনে পোড়ায়।

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। মোটামুটি ভালো ছাত্র বলেই পরিচিত ছিলাম। ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য মনোনীত হওয়ায় ক্লাস শেষে হেড স্যার একা ডেকে নিলেন অফিসে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য। স্যারের রুম থেকে বের হয়ে দেখি বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। বন্ধুরা সবাই চলে গেছে যার যার গন্তব্যে। স্কুল প্রায় ফাকা। তখন ছিল ঘোর বর্ষা।

বৃষ্টির মাত্রা এতো বেশি ছিল যে, বিকেলেই ছেয়ে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। স্কুলের পেছনের গেটে বিরস বদনে পাশের রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখে বসে রইলাম ছাতাওয়ালা কোনো পথিকের অপেক্ষায় আর মনে মনে ভাবছিলাম, ঐতিহাসিক কুকুর দৌড় লাগানো যায় কি না। হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়লো মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজে। পাশে দেখি দাড়িয়ে আছেন আমাদেরই এক ব্যাচ সিনিয়র আমাদেরই পাড়ার পটুআপা। বাম হাতে বুকের কাছে বইগুলো চেপে ধরে ডান হাতে শাদা রঙের ছাতা নিয়ে আপা রাস্তায় নেমে পড়েছেন প্রায়। বলবো না বলবো না করতে এক সময় চোখ লজ্জায় মাথা খেয়ে আপাকে অনুরোধ করে ফেললাম আমাকে সঙ্গে নিতে।

আপাও দ্বিধাহীন চিত্তে রাজি হলেন।

দেরি না করে মুহূর্তেই ফুল প্যান্টকে গুটিয়ে হাফ প্যান্ট করে ফেললাম। পায়ে স্যানডাল, বগলে বই নিয়ে ছোট ছাতার নিচে সঙ্গীসহ শুরু করলাম কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মেটো পথে সতর্ক যাত্রা। উদ্দেশ্য, প্রায় এক কিলোমিটার দূরের বাসস্থান।

পটুআপা আমাদের পাড়ারই সম্ভ্রান্ত এক হাজি বাড়ির মেয়ে। গ্রামের মেয়ে হিসেবে চলনে–বলনে যতোটুকু লজ্জা বা নম্রতা থাকার প্রয়োজন ছিল তার কোনোটাই পটুআপার মধ্যে ছিল না। অনেকটা ড্যাম কেয়ার স্বভাবের ছিলেন। চলাফেরায় ছিল উদ্দামতা আর উচ্ছলতা যা সহজেই মাদকতা ছড়ায়। এসব কারণে আপার একটা আলাদা পরিচিতি ছিল। চেহারা ছিল মানানসই, গায়ের রঙ ফর্শা। মোটা ধাচের না বলে স্বাস্থ্যবতী যুবতী বলাই শ্রেয়। এমন নারী একজন পুরুষের আরাধ্য না হোক আকাঙ্ক্ষিত তো বটেই।

সেদিন বৃষ্টি এতো বেশি ছিল যে, চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। কয়েক গজ দূরের জিনিসও ঝাপসা দেখায়। সঙ্গে থেমে থেমে দমকা বাতাস। প্রায় জনশূন্য পথ। এক প্রকার ভীতিপ্রদ আবহাওয়া। যেন এখনি মহাপ্রলয় হবে। এমন অবস্থায় ছোট ছাতার নিচে পথ চলতে গেলে দুজনেরই ভিজে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। হলোও তাই। দুজনেই অর্ধেক করে ভিজে গেলাম। তাছাড়া পথ ছিল পিচ্ছিল। পা পিছলে অনিবার্য ধরণীপাত হওয়া থেকে বাচার জন্যই অবচেতন মনেই মাঝে মাঝে আমরা পরস্পরে গায়ে নিপতিত হচ্ছিলাম। আমার এক হাত খালি থাকায় কখনো সে হাত চলে যাচ্ছে

আপার জামাতে, বাহুতে কিংবা পশ্চাদ্দেশে, কোমরে। তখন কেবল নিরাপদে বাড়ি পৌছানো ছাড়া মাথায় অন্য কিছু ছিল না। হঠাৎ স্যানডালসহ কর্দমাক্ত চোরাগর্তে আমার পা আটকে গেলে উপুড় হয়ে অনিবার্য পতন ঠেকাতে প্রতিক্রিয়ায় কখন যে পটুআপার কোমর আকড়ে ধরলাম খেয়ালই করলাম না। তাকিয়ে দেখি আপা মুচকি হাসছেন।

সংবিৎ ফিরে এলে নিজেই লজ্জিত হয়ে বললাম, সরি! কিছু মনে করবেন না আপা।

আপা বললেন, সরি–টরির মতো কিছু হয়নি। উঠে দাড়াও।

তাড়াতাড়ি উঠলাম। পরবর্তী ঘটনাগুলো আমার জীবনের সামনে উন্মোচিত করলো অজানা অধ্যায়ের। এতে আমার বিন্দুমাত্রও ইন্ধন ছিল না। ছিল না কোনো প্রধান কুশলীর ভূমিকা। এ জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে আমাকে সামান্য অনুঘটক হিসেবে মনে করতে পারেন সত্য। কিন্তু ঘটনার মূল নায়ক বা পরিচালক অন্যজন।

হঠাৎ পটুআপা এক অবাক কাণ্ড ঘটালেন। আমাকে তার বুকের কাছে রক্ষিত বইগুলো বহন করার দায়িত্ব দিয়ে নিজের পরনের ট্রাউজার ঠিক আমারই মতো করে গুটিয়ে হাটুর উপরে তুলে আনলেন। গায়ের জামাকে কোচ মেরে জড়িয়ে নিলেন কোমরে। এতে হাটুসহ উরুর বিরাট অংশ অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। আমি বিমুগ্ধ চিত্তে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। এত জীবন্ত! প্রাণবন্ত। একেবারেই চোখের সামনে সত্যিই কল্পনা অতীত। একটু আগেই আপা যখন সামনে ঝুকে জামা গোটাচ্ছিলেন তখন বুকের বেশ খানিকটা অংশ অনাবৃত হয়েছিল। তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। বয়সের অনুপাতে অধিক বর্ধিত ডিম্বাকৃতির দুটি মাংসপিণ্ড সত্যিই মোহনীয়। আমার শরীরে তখন এক ধরনের তাপবোধ হতে লাগলো। এ বৃষ্টির মধ্যেই তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলাম।

পটুআপার এরপরের কাজটি ছিল আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আমাকে তার বাম হাত দিয়ে আপা জড়িয়ে ধরলেন। আমার ডান হাতকে নিয়ে গেলেন তার ছাতা ধরা হাতের বগলের নিচে যেন পাশাপাশি জড়াজড়ি করে হাটা যায়। এভাবেই হাটতে বললেন এবং জানালেন, এমনভাবে হাটলে আর পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি থতমত খেয়ে নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার অবস্থা। বুকের মাঝখানে চিনচিনে ব্যথা বোধ হলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্মার্ট হবার চেষ্টা করলাম। আমার হাত বগলের নিচে থাকার কথা থাকলেও সেটা সেখানে যে স্থির থাকতে হবে তার কোনো মানেই নেই। পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য খুব কম ব্যাপারই থাকে। তাই তা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ডান বুকের নরম অথচ পিচ্ছিল মাংসপিণ্ডে হামলা শুরু করলো। অনেক আগেই আমি

যুবক হয়ে গিয়েছিলাম। নারীর দেহ নিয়ে গবেষণাজাত অভিজ্ঞতা না থাকলেও বুকের মাংসপেশিকে কিভাবে এক তাল কাদায় পরিণত করতে হয় তা আমার ভালোই জানা ছিল। সে দায়িত্বটাই পালন করলাম নিপুণভাবে।

এদিকে আমার শরীরে হাজার ভোল্টের বজ্রপাত। পায়ের স্যানডাল কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল নেই। ঘন শ্বাস আর অবিরত পথ চলায় হাফিয়ে উঠলাম। তখন অনিবার্য হয়ে উঠলো যাত্রা বিরতির। নিরুপায় হয়ে পথের পাশের এক গোয়াল ঘরের চালার নিচে আশ্রয় নিলাম। দুজনেই ভিজে জবজবে। গোয়াল ঘরে দেখলাম দুটা গরু। কিছুটা প্রশস্ত জায়গায় আর মশামাছি তাড়ানোর জন্য খড় বিচালিতে গড়া একটি আগুনের স্তূপ যাতে ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন যেন একটি ফায়ার প্লেস। বৃষ্টির ছাট থেকে বাচার জন্য একটু পরে দরজা ঠেলে গোয়ালের ভেতরে ঢুকলাম। গোয়ালে রক্ষিত খড় বিচালির কিছু অংশ দিয়ে আগুনকে উসকে দিলাম এবং কিছু অংশ স্যাতস্যাতে মেঝেতে বিছিয়ে বানিয়ে ফেললাম সুন্দর নরম বিছানা। গোধুলির অন্ধকারে এ নির্জন গোয়াল ঘরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে আমরা দুজন মানব–মানবী এখন মুখোমুখি। ফায়ার প্লেসের পাশে যেন আমরা অনন্তকাল বসে আছি।

আমি গায়ের জামা খুলে আগুনের ওপর ধরলাম শুকানোর জন্য। পটুআপা বললেন, তারও জামা শুকাতে হবে, যেন জামার হুক খুলে দিই। আমিও বাধ্যগত ছাত্রের মতো আদেশ পালন করলাম। মুহূর্তেই আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো ব্রা, প্যান্টিহীন একজন রমণীর নিরাবরণ দেহ। জীবনে এই–ই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি তখন আমার মধ্যে নেই। আমার আত্মারাম বিচরণ করছে অন্য জগতে। মুহূর্তেই পরিণত হয়ে গেলাম এক শৌখিন কৃষকে। জমি চষার লাঙ্গল নিয়ে প্রস্তুত ভূমিহীন চাষী।

প্রকৃতি এ জায়গাতেই একমাত্র উদার। উজ্জীবনী মানব মানবী মাত্রই কামকলার যাবতীয় কৌশল প্রকৃতির পাঠশালা থেকে নেয় বিনা পাঠদানে। আমিও সেই পাঠশালার একজন মনোযোগী ছাত্র হিসেবে জীবনের প্রথম পাঠে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলাম। নিজের ঠোটে চেপে ধরলাম পটুআপার ঠোট। লবণাক্ততার স্বাদ নিলাম। রক্ত তখন আগুন। ঠোটজোড়া নামিয়ে আনলাম আরো নিচে কণ্ঠদেশে, পেছনে খোপার নিচে কানের লতিতে। আমাকে জড়িয়ে ধরে কালনাগিনীর মতো নিঃশ্বাস ফেলছে পটুআপা। উত্তেজনার সলতে পুড়ে আমার পাঠকে আরো গভীরতর করলাম আরোহণ করলাম ডিম্বাকৃতির পাহাড় চুড়ায়। বিচরণ করলাম শানুদেশে। তারপর উপত্যকার খাদে যেখান নেমে গেলাম আরো নিচে কর্ণফুলী নদীর ওয়াগগার বাকে এবং সীতাকুণ্ডের পাহাড়ের উষ্ণ প্রস্রবণে।

ক্ষুধার্ত অজগরের শিকার ধরার মতো আমাকে যখন নিষ্পেষণ করতে তৎপর পটুআপা তখনই শুরু করলাম আমার জীবনের চূড়ান্ত পাঠ। চূড়ান্ত পরিণতিতে যখন আমরা নিযুক্ত হলাম তখন পেলাম ভাঙনের শব্দ।

কতোক্ষণ নিস্তেজ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। বাইরে দেখলাম অন্ধকার গাঢ়। বৃষ্টির তেজ অনেকখানি কমে এসেছে। দুজনে আরো কিছুক্ষণ বাইরের জগৎকে ভুলে গিয়ে শুয়ে থাকলাম ফায়ার প্লেসের পাশে নিবারণ। ঝাপসা আলোয় পটুআপাকে লাগছে মোহনীয় অপরূপ। বিশাল কেশ গুচ্ছ পেছনে টেনে ধরে ঠোটে দংশন করলাম পুনর্বার, বার বার। ফিশ ফিশ করে বললাম, তুমি আমার ভালোবাসা, প্রথম প্রেম, পহেলি পেয়ার।

এ প্রেমকে আমি বৃথা যেতে দিতে চাইনি। সম্মান দেখিয়েছি। রূপ দিতে চেয়েছি চিরজীবনের জন্য। বয়স, পারিপার্শ্বিকতা, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুর বিরুদ্ধে দাড়িয়েও পটুকে চিরদিনের জন্য আমার করে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি নিয়তির নিষ্ঠুর কষাঘাতে। অর্থবিত্ত আর সুনামের কাছে তাকে বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। সে নিজে রাজি হয়েছিল কিংবা রাজি করতে বাধ্য করেছিল তার পৃষ্ঠপোষকরা। সে পরাজিত হয়েছে কিংবা আমি পরাজিত হয়েছি। কিন্তু সর্বোচ্চভাবে পরাজিত হয়েছে আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা। জীবনের তেত্রিশটি বছর পেরিয়ে এসেছি। আজো আমি একা, নিঃস্ব। যে পটু আমাকে তার ছাতার নিচে আশ্রয় দিয়েছিল সেই পটুকে আমি আশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম আমার বুকে। আজো তাই ভুলতে পারিনি ফায়ার প্লেসের পাশের সেই মোহনীয় মুহূর্ত, বর্ষাদিনের ছাতা মাথায় দিয়ে সেই পথ চলা।

ঢাকা থেকে

নির্বাক

- - আহসান শাপলা

সন্ধ্যাবেলা। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আজ সারাদিন কোথাও বের হইনি। বিকেলে একটা টিউশনি ছিল। কিন্তু টিপ টিপ বৃষ্টির বিকেলে সুন্দর একটা ঘুমের আবেদন ছিল শরীরে। সন্ধ্যায় একটা টিউশনি আছে। সন্ধ্যাবেলার টিউশনি সাধারণত মিস করি না। এই টিউশনিটার প্রতি আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা। এমনকি বন্ধের দিনও পড়াতে যাই। ভাইবোনকে এক সঙ্গে পড়াই। ছাত্র পড়ে ক্লাস টেনে আর ছাত্রী ক্লাস নাইনে। ছাত্রীর নিষ্পাপ চেহারা ও চমৎকার ব্যবহার আমার কাছে আবেদনময়ী। এই আবেদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ সময় সাপেক্ষ।

সিদ্ধান্ত নিলাম পড়াতে যাবো। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি। আমার রুমমেটের ছাতা নিয়ে হাটা শুরু করলাম। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে টিউশনির বাসায় পৌছালাম।

ছাত্রছাত্রীর মা ভেতর থেকে বললেন, কি দরকার ছিল এই বৃষ্টিতে ভিজে আসার।

তার কথায় আন্তরিকতা মেশানো ছিল কি না তা না ভেবেই বললাম, আন্টি, সামনে এদের পরীক্ষা। বোঝালাম আমার দায়িত্ববোধ। কিন্তু আমিও বুঝি না এটা দায়িত্ব বোধ, না অন্যকিছু।

ছাতা থেকে পানি ঝরছে। ছাতাটি ড্রয়িং রুমের এক কোণে রেখে পড়ানোর রুমে গেলাম। ছাতার অক্ষমতার কারণে কিছু দুষ্টু বৃষ্টি আমার শরীর স্পর্শ করেছে। সালাম সম্ভাষণ পর্ব শেষ হতেই ছাত্রী তোয়ালে নিয়ে সামনে হাজির। এটা তার প্রচণ্ড দায়িত্ব বোধ অথবা মমত্ব বোধের একটা উদাহরণ হতে পারে। পড়ানো শেষে ছাতা নিতে খেয়াল ছিল না। এদিকে তখন বৃষ্টিও ছিল না। মাঝপথে এসে ছাতার কথা মনে পড়লো। কিন্তু ফিরে যেতে ইচ্ছে করলো না। ভাবলাম আগামীকাল নেবো। তবে সেদিনও ছাতা নিতে ভুলে গেলাম। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর ছাত্রের কাছে ছাতার কথা বললাম।

ছাত্র বললো, স্যার, আমরা তো ছাতা পাইনি।

আন্টির কাছেও ছাতার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আন্টিও তার ছেলের কথা অনুসরণ করলেন।

ছাত্রী নির্বাক। মাঝখানে তার অবাক দৃষ্টি ভেঙে শুধু বললো, স্যার, আপনি অন্য কোথাও রাখতে পারেন।

এ বিষয়ে আর কথা না বাড়িয়ে তাদের পড়িয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

পথে একটা আধুলি দিয়ে একটা সিগারেট কিনলাম। সিগারেটের সামনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে ধোয়ার আলিঙ্গনে এগিয়ে চললাম। ভাবতে লাগলাম, তাহলে অন্য কোথাও ফেললাম কি? না। তা হতে পারে না। কারণ ছাতাটা কিভাবে বন্ধ করলাম, কেমন করে পানি ঝরছিল, কোথায় হেলান দিয়ে রাখলাম সব যেন মনের দরজায় দুপুরের সূর্যের আলোকে উকি দিচ্ছিল।

দুই দিন পর রুমমেটকে ছাতা হারানোর কথা বিনীতভাবে বললাম। এবং তাকে টাকা দিতে চাইলে সে বললো, টাকা বড় কথা নয়, ছাতাটা আব্বু সউদি থেকে পাঠিয়েছেন।

বুঝলাম এখানে বেশি কথা বলে কোনো লাভ নেই শুধু দুঃখ প্রকাশ ছাড়া। রুমমেট বেশ মন খারাপ করলো আমার প্রতি। নিয়মিত পড়াতে যাই। দরজা খোলার পর সেই জায়গা চেয়ে দেখি যেখানে ছাতাটি রেখেছিলাম। রুমমেটের কাছে নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়। একবার ভাবি পড়ানো ছেড়ে দেবো। কিন্তু পরক্ষণে নিজেই নিজের কাছে পরাজিত হই কোনো এক নির্বাক শক্তির কারণে।

যাই হোক। পড়ানো চালিয়ে যেতে থাকি। বেশ কিছুদিন পর তাদের রুমে সেই ছাতাটি দেখি। মনে মনে ভাবি কিভাবে বলবো। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছাতাটি ভালোভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখি। এক সময় নিশ্চিত হই এটাই সেই ছাতা। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি না। একদিন ছাত্রকে কৌশলে ছাতাটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। এবং ছাতাটি নিয়ে আসতে বললাম। লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম এটা আমার রুমমেটের ছাতা।

সব চেষ্টা বিফল হলো। বরং ছাতাটি যে তাদের সেটার পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি প্রমাণ দেখালো এবং বললো, বেশ কিছুদিন ধরে এই ছাতাটি তারা পাচ্ছিল না। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কয়েকদিন আগে এটা বের হয়েছে।

সব যুক্তি-প্রমাণই আমার কাছে অসার মনে হলো। ছাত্রী নির্বাক। সে অংক নিয়ে মহাব্যস্ত।

কোনো উপায় না দেখে বললাম, ওকে, আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি একশ ভাগ নিশ্চিত হলাম যে, ছাতাটি আমার রুমমেটের।

পরের দিন আন্টি বললেন, এদের আব্বা সউদি থেকে ছাতাটি পাঠিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, আমার রুমমেট ও ছাত্রছাত্রীর বাবা উভয়ই সউদি থাকেন। আমি আবারও ভুল স্বীকার করে বললাম, আমারও ভুল হতে পারে আন্টি। হয়তো অন্য কোথাও ফেলে এসেছি।

এখানেই যদি ঘটনা শেষ হয়ে যেতো তাহলে কোনো কথাই থাকতো না। কিন্তু নির্মম পরিহাস ঘটলো দুই মাস পরে। একদিন আমার স্পেশাল কলিং বেলের শব্দে ছাত্র দরজা খুলেই বললো, স্যার, আপনার ছাতা পাওয়া গিয়েছে।

আমি ভাবলাম যাক ভুল বুঝতে পেরেছে। চেয়ারে বসে অনেক কিছুই ভাবছি। ছাত্র হাসতে হাসতে একটা ছাতা নিয়ে এলো। ছাতাটা খুলতেই দেখতে পেলাম সেটা পুরনো, মাঝে মাঝে ছেড়া। আমার মুখ যেন শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ ছেয়ে ফেললো। এটা কখনোই আমার রুমমেটের ছাতা হতে পারে না। আরেকটি ছাতা যেটা প্রকৃতপক্ষেই আমার রুমমেটের ছাতা সেটা নিয়ে আসতে বললাম। দেখতে পেলাম ছাতা দুটোর মডেল একই এবং একই কম্পানির। পার্থক্য শুধু একটা পুরনো আন্যটা নতুন।

ছাত্রী বাকা ঠোটে একটা নির্বাক হাসি দিয়ে আবার অংক করতে মহাব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ছাত্রকে বললাম, এটা রেখে দাও, আমার রুমমেটকে ছাতা কিনে দিয়েছি। কতোকগুলো অব্যক্ত প্রশ্ন নিয়ে রুমে ফিরলাম।

ইব্রাহিমপুর, ঢাকা থেকে

বৃষ্টি ও দৃষ্টি

- - শেখ রাসেল

সুতপার মতো একটা প্রবল সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কিভাবে আমার মতো একটা সরল ও তরল ছেলের প্রেম হয়ে গেল সেটা আরো অনেকের ন্যায় নিজের কাছেও এক বিরাট বিস্ময়। এ বিষয়ে সুতপার নিজের মতামতটি অবশ্য মোটেও প্রীতিকর কিছু না।

সে বলে, অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করলে তাকে তো তোমার মতো এভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারতাম না। বুঝলে তো, গাধু?

গাধার সঙ্গে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক মিল খুজে পেয়েছে বলে সুতপা আমাকে আদর করে গাধু ডাকে।

সুতপার এ ধরনের কথায় স্বাভাবিকভাবেই আমার খেপে ওঠা উচিত। কিন্তু আমি ক্ষিপ্ত হইনি। কারণ নাকে দড়ি দিয়ে হোক আর হৃদয়ে দড়ি দিয়েই হোক মেয়েটা আমাকে ঘোরাচ্ছে তো বটেই। প্রায় প্রতিদিনই ক্লাস শেষে সে আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়। সুতপার মতো বাউণ্ডেলে মেয়ে যদি এই দেশে আরো দশটা থাকতো তাহলে দেশের পর্যটন খাতের আয় অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যেতো। এক্ষেত্রে হয়তো জ্ঞানতাপস কিবরিয়া শত চাইলেও দেশের অর্থনীতি ফুটো করে দিয়ে যেতে পারতেন না।

প্রতিদিন ক্লাস শেষে ঘুরতে বের না হলে সুতপার নাকি একদম দমই বন্ধ হয়ে আসে। আজ সে আমাকে নিয়ে এসেছে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের রিসার্চ সেন্টারের কাছে। রিসার্চ সেন্টারের পাশেই একটা স্বচ্ছ জলের পুকুর আছে। একটা পুকুরও যে দেখতে কতোটা সুন্দর হতে পারে সেটা এ পুকুরটা না দেখলে বোঝা যাবে না। এসএসএফ-এর সদস্যরা যেমন শেখ হাসিনাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখতো তেমনি পুকুরটাকেও চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো নারকেল গাছ। আমি আর সুতপা একটা নারকেল গাছের গোড়ায় বসলাম।

সুতপার একটা আজব স্বভাব হলো, সে কখনো আমার গা ঘেষে তো বসেই না, বরং সব সময় আমার কাছ থেকে দুই তিন হাত দূরে বসে। তার এ আচরণ দেখে যে কারোই মনে হতে পারে, আমি একটা ট্রাক এবং আমার গায়ে লেখা আছে ১০০ হাত দূরে থাকুন কিংবা কেউ এমনো মনে করতে পারে যে, আমি হচ্ছি ছাত্রলীগ নেতা জসিমউদ্দিন মানিকের ছোট ভাই এবং যে কোনো মুহূর্তে সুতপাকে দিয়ে নতুন একটা সেঞ্চুরি ইনিংস সুচনা করে ফেলতে পারি।

আজো সুতপা যথারীতি আমার কাছ থেকে তিন হাত দূরে বসলো। হালকা স্বরে বললাম, তোমাকে আর আমাকে দেখলে মানুষ কি ভাববে জানো? মানুষ ভাববে, তোমার ও আমার মাঝখানে আছে

বর্ডার লাইন। বর্ডারের একপাশে তুমি বিডিআর, আরেক পাশে বিএসএফ সৈন্য এবং যে কোনো মুহূর্তে, এমনকি রাতের অন্ধকারে নিশিকুটুম্বের মতো তোমার ওপর আমি হামলে পড়তে পারি।

বিদ্রূপটা কাজে লাগলো। সুতপা বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, বর্ডার ভাঙছি।

সুতপা এক হাত এগিয়ে এলো। এখনো আমাদের মাঝখানে দুই হাতের মতো ব্যবধান। আমি চাইলাম এ দূরত্বটাও বিলীন করে দিতে। বললাম, এখনো তোমার আর আমার মাঝখানে শাটল ট্রেন চলাচল করার মতো জায়গা আছে।

সুতপা আমার চাল বুঝতে পারলো। সে ঝাল মেশানো কণ্ঠে বললো, তোমার মতলব তো ভালো ঠেকছে না। চুপচাপ পুকুর দেখো। না হলে একদম নাকে খত দেয়াবো।

আমি সুবোধ বালকের মতো পুকুরের দিকে তাকালাম। ঝকঝকে স্বচ্ছ জল। বর্ষার আকাশে মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা চলছে। আকাশের সেই খেলার ছায়া পড়ছে পুকুরের স্বচ্ছ জলে।

কিছুক্ষণ পর আকাশের বুক চিরে হালকা ধরনের ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হলো। আমার ব্যাগে ছাতা আছে। কিন্তু এ ধরনের আদুরে বৃষ্টিতে ছাতা বের করার দরকার হয় না।

সুতপা বললো, বৃষ্টিটা খুব ইনোসেন্ট, তাই না গাধু? এ রকম বৃষ্টিতে কি মাথায় ছাতা দেয়া লাগে?

না, ছাতা দেয়ার দরকার নেই।

অথচ দেখো, আমাদের পেছনের কাপলটা এই বৃষ্টিতেও ছাতা দিচ্ছে।

সুতপার কথাটা শুনে আমি এই প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করলাম এই পুকুর পাড়ে আমরা ছাড়াও আরেকটা কাপল আছে। আমাদের মাত্র দশ পনেরো হাত পেছনে তারা একটা নারকেল গাছের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এই ভরদুপুরে কেউ এখানে ঘুরতে আসবে এটা আমার মাথায়ও আসেনি। আসলেই আমি একটা গাধু।

হাসতে হাসতে বললাম, সেখানে ছাতার বহুমুখী ব্যবহার হচ্ছে। তারা আসলে খোদার বৃষ্টি না বরং মানুষের দৃষ্টি থেকে বাচার জন্য ছাতা ব্যবহার করছে।

তোমার মাথা! মানুষের দৃষ্টি থেকে বাচতে চাইবে কেন?

ছাতাটা উল্টাতে পারলেই সেটা বুঝবে।

কথাটা বুঝতে পেরে সুতপার ফর্শা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে কাপা কাপা গলায় বললো, তারা বুঝি এখানে এসব করছে?

সুযোগ পেয়ে বললাম, সব মেয়ে কি আর তোমার মতো মাঝখানে শাটল ট্রেন চলার জায়গা রেখে বসে?

এক দৃষ্টিতে তাদের ছাতার দিকে তাকিয়ে আছি। ছেলে–মেয়ে দুটো কোনোমতে নিজেদেরকে ছাতার নিচে লুকিয়ে রাখছে। ছাতাটা রহস্যজনকভাবে কাপছে।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের এই জায়গাটা দিয়ে লোক চলাচল তুলনামূলকভাবে কম। তারা ভালো জায়গাই বেছে নিয়েছে।

এই গাধু, তুমি এভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে আছো কেন? আইনের ছাত্র হয়ে বেআইনি কাজ করছো? তাদের কি প্রাইভেসির অধিকার নেই?

সুতপার কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল। তাদের ছাতাটা হঠাৎ করে ছুটে পড়ে গেল। ছেলেটা তখন চরম আবেগে মেয়েটার ঠোটে চুমু খাচ্ছিল। ছাতাটা তাদের অসতর্কতা বা অতি আবেগের চাপেই হয়তো পড়ে গিয়েছিল। ছাতাটা পড়ে যাওয়া মাত্রই মেয়েটা দ্রুত এক হাতে ছেলেটাকে বিযুক্ত করলো, আরেক হাতে ছাতাটা আবার তুলে নিল। আবেগে অন্ধ ছেলে–মেয়ে দুটো আমাদেরকে দেখতেই পেল না। তারা আবারও ছাতার নিচে হারিয়ে গেল।

আমরা আর কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু এটুকু দেখেই সুতপা বেচারি লজ্জায় নুয়ে পড়ে যাচ্ছে। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন তার কারসাজিতেই ছাতাটা পড়ে গিয়েছিল যেমন সালমান রহমানদের কারসাজিতে শেয়ার বাজারের সূচক পড়ে গিয়েছিল।

এখানে আর এক মুহূর্তও না বলে সুতপা দ্রুত দাড়িয়ে গেল।

হাসতে হাসতে বললাম, আমার ব্যাগেও ছাতা আছে সুতপা।

খবরদার গাধু। উল্টোপাল্টা কথা বলবে না। এক্ষুণি চলো এখান থেকে।

সুতপার একান্ত বাধ্যগত প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার পিছু নিলাম।

আমার ছাতাটার বহুমুখী ব্যবহার কি কোনোদিনই হবে না?

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

স্পর্শ

- - মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান রূপম

এই তো কিছুদিন আগেও যে ছাতা বয়ে বেড়াতে একটুও ভালো লাগতো না সে ছাতাই দিয়েছে আমাকে অজানা সুখের অনুভূতি। এ ছাতাই এখন সামান্য মেঘলা আবহাওয়ায় আমার এক রোমাঞ্চকর সঙ্গী। আকাশে মেঘ দেখলেই এখন শরীর মন এক অতৃপ্ত সুখে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারা

দেহ যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় ছাতার সেই দুর্লভ উপহারের কথা যা এখনো যেন অতি মাত্রায় জীবন্ত।

আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। সেদিন টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ছিল। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই ছাতা নিয়ে ক্যাম্পাসে গেলাম। পরীক্ষার পর এসএম হল থেকে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মেইন গেটের দিকে যাচ্ছি রিকশা নেয়ার জন্য। দুপুরের বাস চলে গেছে। বৃষ্টি চলছেই, ক্যাম্পাস প্রায় ফাকা, দুপুর তিনটা হবে হয়তো। কাফেটারিয়া পার হয়ে এসেছি এমন সময় পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলাম।

এই রূপম।

আমি পেছন ফিরেই দেখি যুথিআপা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দাড়িয়ে রয়েছেন কাফেটারিয়ার বারান্দায়। যুথিআপা মাস্টার্স পরীক্ষা দিচ্ছেন। বিবাহিতা। প্রেম করে বিয়ে করেছেন। শুনেছি আপার স্বামী এখন কুয়েতে থাকেন। আপার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তাকে খুব ভালো লাগতো আমার। চমৎকার ফিগার, সুন্দর মুখশ্রী, কথা বলেন অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গিতে। এক কথায় তিনি মন ভোলানো সুন্দরী।

কেমন আছেন যুথিআপা?

ভালো। তুমি?

ভালোই।

কোথায় যাচ্ছো? মেইন গেটে।

চলো, আমিও যাবো। ছাতাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিয়ে আসতে পারিনি আজ।

বাজারে যাবেন?

হ্যা।

আমি বাসায় যাচ্ছি। আপনাকে না হয় বাজারে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

যুথিআপা বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গে হাটা শুরু করলেন। ছাতাটা ছোট। তাই বৃষ্টির ছাট লাগছিল গায়ে। আমরা টুকটাক কথা বলতে বলতেই হাটছি। বৃষ্টির ছটাতে আপার গোলাপি জামা জায়গায় জায়গায় ভিজে খুব আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। কেমন যেন একটা সুবাস আসছিল আপার শরীর থেকে। খরার দিন বৃষ্টি হলে যেমন মাটি থেকে সোদা গন্ধ বের হয় ঠিক তেমনি আপার শরীর থেকে দেহের উত্তাপের জন্য মন মাতাল করা ভেজা গন্ধ বের হচ্ছিল। আমার দেহের সমস্ত শিরাগুলো

কি যেন এক স্বাদ পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল বারে বারে সেই সুবাসে। হঠাৎ বিকট আওয়াজে কোথায় যেন বাজ পড়লো।

যুথিআপা চমকে উঠে আমার বাম হাতটা জড়িয়ে ধরলেন। আমার সারা শরীর জুড়ে এক ধরনের শিহরণ বয়ে গেল আমার বাম পাশ উত্তপ্ত নরম বুকের স্পর্শে। সেই উষ্ণতায় আমি একেবারে দিশেহারা। তার উপর পাগল করা সেই মেয়েলি সুবাস। বেসামাল অবস্থা একেবারে আমার। হাটতে হাটতে মাঝে মাঝেই আপা বৃষ্টির জন্য আমার শরীরের সঙ্গে সেটে আসছিলেন। তাই তার উষ্ণ নরম বুকের চাপ পড়ছিল আমার দেহে। আমি একেবারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আপাও হয়তো উপভোগ করছিলেন আমার সঙ্গ।

আসলে পরিবশেটাই ছিল কেমন যেন রোমাঞ্চকর। মনে হচ্ছিল যেন এক বিমর্ষ আবেগ আমাদের চারপাশে পানি হয়ে ঝরে পড়ছে। মেইন গেটে আসার পর ভাড়া ঠিক করে আমরা রিকশায় উঠলাম। বৃষ্টি পড়ছে অনবরত। তাই পর্দা নিয়ে ছাতা ধরেছি। সম্মুখে আড়াল হয়ে গেছে একেবারে। চাপাচাপি করে বসতে হয়েছে হুড তোলা বলে। ঝাকুনিতে আপার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করছিলাম চুপচাপ। আপাও ছিলেন নিশ্চুপ।

হঠাৎ যুথিআপা আলতো করে আমার হাতটা ধরে একটা চুমু দিলেন। আমি তো একেবারেই হতবাক। বিস্ময়তা কাটিয়ে উঠে আমিও চেপে রাখা উন্মাদনায় পাগল হয়ে আপার হাতে, মুখে অনেকগুলো চুমু দিলাম অনভিজ্ঞের মতো। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার বাম হাত তার বুকের ওপর অসাড় হয়ে পড়েছিল। ডান হাতে ছাতা ধরে আছি।

আপার নরম উত্তপ্ত বুকের স্পর্শে আমার বাম হাত হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো অজানা সুখের প্রত্যাশায়। কি যে সুখ, কি যে বিচিত্র অনুভূতি, কেমন যেন এক অজানা শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল আমার সারা দেহে জুড়ে। ভাইয়া নেই এ জন্য হয়তো আপাও অনেক দিন ধরে তৃষ্ণার্ত ছিলেন। উন্মাদিনীর মতো তিনিও আমার চোখে, ঠোটে, গলায় চুমু দিতে শুরু করলেন প্রবল বেগে যেন ঝড় শুরু হয়ে গেল রিকশার ভেতরে। আমার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরাগুলো উপভোগ করছিল প্রতিটি স্পর্শ।

ঠিক এই সময় রিকশাচালক বললো, মামা, বাজারের মোড়ে থামাবো।

আমি কোনো রকমে বললাম, হু।

যুথিআপা অগোছালো নিজেকে ঠিক করে নিয়ে সুন্দর একটা হাসি দিয়ে নেমে পড়লেন রিকশা থেকে।

সেদিন বাড়ি ফিরে অতৃপ্ত আমি বিমূঢ় হয়ে বসে শুধুই যুথিআপার স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম। পরের দিন বিশেষ একটা কাজে বেশ কিছুদিনের জন্য ঢাকা গিয়েছিলাম। এসে

যুথিআপার সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। শুনেছি তিনি পরীক্ষা শেষ করেই কুয়েতে চলে গেছেন। সব কিছুই আগে থেকেই ঠিক ছিল নাকি।

আপার সেই স্পর্শ এখনো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ছাতা দেখলেই, এখনো যেন আপার সেই তপ্ত নিঃশ্বাসে দেহ শিহরিত হয়। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন সেখানেই যা আমার ছাতার বদৌলতে পেয়েছি।

শাপলা লেন, রাজশাহী থেকে

আয়না পড়া

--জসিম জনি

খুব ছোটবেলা, বয়স তখন কতো হবে জানি না। মাথায় ঠিক মতো বুদ্ধি হয়নি। চাচা-চাচির কাছে থাকতাম। প্রতিদিনের বাজার করতে হতো আমাকে। বাসা থেকে কাগজে লিখে নিতাম কি লাগবে। স্লিপ দেখে বাজার করতাম। বর্ষার সময় একদিন বাজারে যেতে হলো আমাকে। টিপটিপ বৃষ্টি থাকায় চাচিকে বললাম চাচার ছাতাটা দিতে।

চাচি দিতে চাইলো না। বললেন, হারিয়ে যাবে।

আশ্বস্ত করে বললাম, হারাবে না। আমার হাতেই থাকবে।

চাচি দিতে না চাইলেও জোর করে নিয়ে গেলাম। বাজারে যেতেই বৃষ্টি কমে গেল। মেঘগুলো কোথায় যেন হারিয়ে সূর্যের তির্যক কিরণ পড়ে সমস্ত প্রকৃতি যেন ফকফকিয়ে উঠলো মুহূর্তে। ছাতাটা গুটিয়ে হাতে নিলাম। তারপর যথারীতি স্লিপ দেখে বাজার করতে লাগলাম এক দোকান থেকে আরেক দোকান। মোড়ের একটি বড় দোকান থেকে কি যেন কিনেছিলাম মনে নেই। বাজার করা শেষ হলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বাড়ির কাছে আসতেই ছাতার কথা মনে হলো। হাতের দিকে তাকালাম, হায়! ছাতা নেই। তৎক্ষণাৎ দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মনে করতে লাগলাম ছাতা কোথায় ফেলে এসেছি। মনের কোণে ভেসে উঠলো মোড়ের দোকানটিতে ছাতা রেখে হাতে বাজার নিয়েছিলাম। দ্রুত আবার মোড়ের দোকানে ছুটে গেলাম। এপাশ-সেপাশ খুজতে শুরু করলাম। কিন্তু না। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটি ছাতা ভুলে রেখে গিয়েছিলাম, পেয়েছেন কি না।

দোকানদার উত্তর দিলেন, পাইনি।

মনের মধ্যে অজানা আতঙ্ক পেয়ে বসলো চাচার ভয়ে। বুক কাপছে। বাড়িতে যাই কি করে। ছাতা হাতে না দেখলে প্রথমে চাচি। তারপর চাচা...। আর ভাবতে পারি না। দুই চোখে চাপা কান্না এলো। মুক্তির পথ খুজতে লাগলাম। আমাকে ছাতা বের করতেই হবে। একটা পথ খুজে পেলাম। আমাদের এখানে এক হুজুর আয়না পড়া দেয়। আয়নাতে চোরকে নাকি দেখা যায়। আমিও ছাতা চোরের সন্ধানের জন্য আয়না পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু হুজুরকে নতুন আয়না কিনে দিতে হবে। এবং হুজুরের ফি দিতে হবে। পড়লাম আরেক বিপদে। এবার টাকার জন্য বাড়িতে গেলাম খুব ভয়ে ভয়ে। প্রথমে চাচিকে বুঝতে দিলাম না ছাতার কথা। তারপর বিশটি টাকা চাইলাম, বললাম খুব প্রয়োজন।

চাচি বললেন, কি করবি টাকা দিয়ে, আগে বল?

নিতান্তাই বাধ্য হয়ে সত্য বলে ফেললাম।

চাচি তো শুনে টাকা দেয়ার কথা রেখে ছাতা কি করে হারালো তা নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই অস্থির। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললাম, মোড়ের দোকানে ভুলে ফেলে এসেছি। এরপর গিয়ে আর পেলাম না। কে যেন নিয়ে গেছে। আয়না পড়া দিলে চোরকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো।

চাচি এবার একটু শান্ত হয়ে বললেন, আয়না পড়া দিলে চোরের ছবি দেখা যাবে, তাকে তো পাওয়া যাবে না। ছাতাও আর আসবে না। হয়েছে এসব করতে হবে না।

বললাম, চাচা যে মারবেন।

চাচির বিনম্র উত্তর, সেটা আমি বুঝবো।

তারপর আমার খুশি দেখে কে। তখন মনে হলো এই মাত্র কোনো কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত হলাম। এবং আমার সেই মুক্তিদাতা হচ্ছে একমাত্র চাচি।

লালমোহন, ভোলা থেকে

আড়িয়াল বিলে

- - মীর মফিজুল ইসলাম

অনেক দিনের পুরনো সেই সোনালি স্মৃতি আজো আমাকে নিয়ে যায় ৩৫ বছর আগের একটা সময়ে। তখন আষাঢ় মাস। বাবার হুট করে সিদ্ধান্ত, বিয়ে করতে হবে। বয়স আর কতো হবে, আঠারো থেকে কুড়ি। কেদে-কেটেও কোনো কূল করতে পারলাম না। ছেলে হিসেবে দেখতে মন্দ ছিলাম না। নানিদের ভাষায় কার্তিকের মতো চেহারা। নিরুপায় হয়ে শেষে রূপচর্চা শুরু করলাম। বাংলা সাবান

রোজ হাতে, মুখে, চুলে মাখতাম। আমার রূপ বেড়ে চললো। রোজ মাথায় সরিষার তেল দিতাম। আয়নাতে নিজেকে দেখতাম আর মুগ্ধ হতাম।

বিয়ের যৌতুক ছিল নগদ ১০,০০০ টাকা, একটা সাইকো ফাইভ ঘড়ি, একটা হিরো সাইকেল, একটা রেডিও আর শ্বশুরমশাই খুশি হয়ে যা দেন। তখনকার মানুষ ছিল খুব সহজ-সরল। বৌভাতে ইলিশ, কুমড়া ভেঙে তরকারি, ডাল, আউশ চালের মোটা ভাত। চালের গুড়া ও মিঠাই দিয়ে মিষ্টান্ত। ব্যাস বরপক্ষও খুশি, কনে পক্ষও খুশি। বিয়ের দিন আমার জন্য যৌতুক ছাড়াও এলো একটা ছাতা, একটা পিতলের বদনা, কাপড়-চোপড়, তেল, সাবান ইত্যাদি।

বিয়ের কয়েকদিন পরে শ্বশুরজি বললেন, বাবা, কলকাতা থেকে এই ছাতাটা তোমার জন্য এনেছি। এটা যৌতুক ছিল না। তোমাকে খুশি হয়েই দিয়েছি। সাবধানে রেখো।

সত্যিই ছাতাটা ছিল খুব শক্ত, কাঠের হাতল, শক্ত কাপড়, শক্ত শিক, এক কথায় খানদানি চিজ।

বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি করে আর কতোদিন? ঢাকায় কাজ শিখে চাকরি নিলাম। সকালবেলা গরম ভাত খেয়ে রওনা হতাম। আড়িয়াল বিল পাড়ি দিয়ে বক্সনগর আসতাম পায়ে হেটে। সেখান থেকে লঞ্চে ঢাকা। পথে বিবি মরিয়মের রাধা খিচুড়ি খেতাম। থাকতাম ঢাকায়। এভাবেই দিন চলছিল। যেখানেই যাই সেখানেই ছাতাটা ছিল আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। পৌষ আষাঢ় বলে কথা নয়, বরং শ্বশুরজানের দেয়া যৌতুকের অতিরিক্ত এক বাড়তি ভালোবাসা। বিয়ের পাচ বছরের মধ্যে দুই কন্যার পিতা হলাম। বৌ মরিয়ম, দুই কন্যা মনোয়ারা, পারুলকে নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল। একদিন খবর এলো শ্বশুরজানের খুব অসুখ। মনোয়ারা, পারুলকে দেখতে চান। অগত্যা অফিস ছুটি নিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। সময়টা বর্ষাকাল।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। দমকা বাতাস। দোয়া-দরুদের ওপর ভর করে দুপুরে বক্সনগর এসে নামলাম। আড়িয়াল বিলে তখন থই থই পানি। নৌকাই একমাত্র মাধ্যম যোগাযোগের। আবহাওয়ার কারণে কোনো নৌকাই আসতে রাজি হচ্ছিল না। অনেক অনুরোধে এক ভাটি বয়সের মাঝি রাজি হলো। পাল তোলা ছৈসহ নৌকা চলছে ভাগ্যের লাঞ্ছনা নিয়ে বৃষ্টি, একটু-আধটু বাতাস, ভয়-শঙ্কা, উৎকণ্ঠার মধ্যে। পথে খিচুড়ি খেলাম। মাঝি পাল তুলে দিয়েছে। হয়তো এ সময় মাঝির মুখে ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বয়াতির গান তুফান তুলতো। কিন্তু আজ সে গম্ভীর। এদিকে বাতাসের দিকবিদিক ছুটোছুটিতে মাঝি পাল নামিয়ে নিল। শুধু এক বৈঠায় এতোদূর পাড়ি দেয়া সম্ভব না। আমিও বৈঠা হাতে নিলাম। ছৈ-এর ভেতর মরিয়মের দোয়া ইউনুস খতম চলছে।

বিকেল বেলা। তখন আমরা বিলের বারোআনি পাড়ি দিয়ে সৈয়দপুর এলাকায় এলাম। আমার বার বার বলাতে পুনরায় পাল তোলা হলো। হঠাৎ দমকা বাতাস। মুহূর্তে কি হয়ে গেল বুঝে ওঠার আগেই পাল ফেটে গেল। নৌকা দিক-বিদিক ছুটছে। নৌকায় পানি উঠা শুরু করেছে। বাচ্চার চিৎকারে মনে হলো নৌকায় পানি ওঠা বেড়ে গেছে।

মাঝির চিৎকার, *আল্লাহরে ডাকেন!* নইড়েন না। চারদিকে থৈ থৈ পানি। আকাশ অন্ধকার। আমি আর মাঝি পানিতে নেমে নৌকা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। কাছেই একটা হিজল গাছের দিকে নৌকা টানছি। বাতাসের বিপরীতে নৌকাকে ধরে রাখতে পারলাম না। নৌকা ডুবে গেল। পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে মনোয়ারা, পারুল। মাঝি মনোয়ারাকে ধরে ফেললো, আমি পারুলকে। আমরা হিজল গাছের কাছে চলে এলাম। সঙ্গে মরিয়মও। গাছের ডালে কোনোমতে দুই কন্যাকে বসালাম। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! অথচ কেউ কাদছে না।

ডুবোডুবির পর নৌকা উঠানো গেল। ঝড় থেমে গেছে। নৌকা সেচলাম। নৌকার মাচান বিলের জলে ভাসছে। নতুন করে নৌকায় উঠলাম। আমার তিন সম্পদ বাদে বাকি সব আড়িয়াল বিলে বিসর্জন দিলাম। বাচ্চার খেলনা, বৌয়ের গহনা, মাঝির সারাদিনের কামাই এবং সেই সঙ্গে শ্বশুরজানের দেয়া ছাতাটা যার মধ্যে ভালোবাসা লেগেছিল। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না।

রাত দশটায় শ্বশুরবাড়ি পৌছালাম। কিন্তু হায়! শ্বশুরজানকে পেলাম না। কাদার মতো অবস্থা ছিল না। পাথর হয়ে গেলাম। শ্বশুরজানকেও হারালাম সঙ্গে স্মৃতিটাও। কেউ আর বলবে না, বাবা, এটা সাবধানে রেখো, তোমার জন্য কলকাতা থেকে এনেছি।

এরপর থেকে আজ প্রায় ত্রিশ বছর ছাতাহীন আছি। বাকি যে কয়দিন বাচি ইচ্ছে নেই সেই জিনিসটার প্রতি।

বর্ষার কারণে শ্বশুরকে কবর দেয়া সম্ভব হয়নি। কলা গাছের ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে আড়িয়াল বিলে। ভাসতে ভাসতে একদিন হয়তো ডুবে যাবেন। মিশে যাবেন মাটিতে আর প্রিয় ছাতার সঙ্গে একাত্মতায়।

ধানমন্ডি থেকে

বৃষ্টির দুশমন

- - মোহাম্মদ আক্তার হোসেন

পারিজাত সংগঠনের সকল সদস্যই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর এই সংগঠনের সকল সদস্যই যেখানে পেশাগত কাজে ব্যস্ত সেখানে লিটন তখনো বেকার। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে সে যেন

কিছুতেই বের হতে পারছিল না। দেখতে দেখতে তার জীবনের ২৯টি বছর হারিয়ে গেল। তারপরও কোনো কূল–কিনারায় তরী ভেড়ানো হলো না।

চলতি বর্ষার কিছুদিন আগে সে হঠাৎ দোকান দিয়ে বসলো ছাতার। যদিও এটা ছিল সিজনাল গুডস তবুও একটা কিছু করার মানসিকতা তাকে বেশ সাহস যোগালো। তাকে সাহস যোগাতে সহায়তা করলো পরিবারের সদস্যরা, পারিজাতের বন্ধুরা।

দোকানটি জীন–শীর্ণ হলেও এটা যে একান্তই লিটনের তা ভাবতেই লিটনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অর্থের পর্যাপ্ততা থাকলে হয়তো দোকানটিকে নিজের মতো করে সাজানো যেতো।

তাই বলে কি সামনের দিকে এগোনো যাবে না? অবশ্যই যাবে। শুধু দরকার কিছুটা সময় আর দরকার এই সময়ের মাঝে পরিশ্রম। পরিশ্রমেরর বদৌলতেই মানুষ মাটিকে ইট আর ইটকে সুউচ্চ প্রাচীরে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। যাই হোক। ছাতার দোকানের বয়স যখন মাত্র তিন দিন পার হলো তখনি এর নামকরণ নিয়ে বন্ধুদের মাঝে ঘনিষ্ঠরা আলাপ করতে লাগলো। এ দোকানটির প্রথম এবং দ্বিতীয় পণ্যটি ছিল যথাক্রমে ছাতা ও রেইনকোট যা কি না বৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম নাম যাচাই বাছাই করতে থাকে। কিন্তু বন্ধুদের একজন মনে মনে এই দোকানের এমন একটি নাম ঠিক করলো যে কাউকে তা জানানো হলো না। দুই দিন যেতে না যেতেই সাইনবোর্ডে নামটি অঙ্কিত বন্ধুটি হাজির। এ ব্যাপারটিও গোপন রাখা হলো।

তারপর গভীর রাতে রাস্তা যখন খুব ফাকা হয়ে এলো তখন আরো দুই বন্ধুর সহযোগিতায় সাইনবোর্ডটি দোকানের সম্মুখভাগে টাঙানো হলো।

সকাল বেলা বন্ধুটি সাইনবোর্ডের নামকরণ নিয়ে আপত্তি তুললেও আমরা দুটো দিন দেখতে বলি।

কেউ ভাবতেই পারেনি দোকানের নামটি এলাকায় এতোটা আলোড়ন তুলবে। শুধু নামের খাতিরেই দোকানটি বর্ষা মরসুমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সেই সঙ্গে সেবাও দিয়ে যাচ্ছিল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

এতো কিছু ঘটলো শুধু দুটি পণ্যের কারণে। আর দোকানটির নামকরণ করা হয়েছিল *বৃষ্টির দুশমন।*

এখন অবশ্য পুরনো পণ্যের সঙ্গে নতুন নতুন পণ্য যুক্ত হয়েছে দোকানের ইনডেক্সে। সেই সঙ্গে দোকানের নামটিও পরিবর্তন হয়ে গেছে *বারোমাসি* নামের সার্থকতায়।

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

দমকা বাতাস

- - ওয়াহিদুজ্জামান

মাটির দেয়াল–এর ওপর খড়ের ছাউনি দিয়ে তিন কামরার প্রাইমারি স্কুলে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সামনের প্রকাণ্ড বট গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে ছড়ি হাতে দাড়ানো প্রায় ছয় ফিটের মতো লম্বা মুখে ফুরফুরে দাড়িওয়ালা রফিজুদ্দীন স্যার আমাদের নামতা পড়ান দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার। আমরা সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করি দুয়েকে দুই।

বিপত্নীক স্যারের বেশভূষা থেকে শাদামাটা জীবন যাপনের সবটাই অন্যদের হাসির খোরাক যোগান দিতো। কোমর পর্যন্ত ঝোলা খাটো পাঞ্জাবি আর হাটু পর্যন্ত উচু করে লুঙ্গি পরে, ছাতা হাতে দুই মাইল পায়ে হেটে ঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগ সব কিছুকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন স্কুলে আসতেন তিনি। পাঞ্জাবির বাম পকেটে থাকতো ভাজ করা পাজামা যদিও তাকে কেউ কোনো দিন পাজামা পরিহিত দেখেনি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, যদি কখনো স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেব হঠাৎ এসে পড়েন তার সামনে তাকে আর লুঙ্গি পরে যাওয়া যাবে না।

স্কুলের পাশে বিওপি ক্যাম্প। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সাত আটজন জওয়ান রাইফেল হাতে ক্যাম্পের সামনে দাড়িয়ে পেট্রোল ডিউটি করে। স্যারকে ক্যাম্প পেরিয়ে স্কুলে আসতে হয়, স্যারের দুশ্চিন্তা এখানে। কখনো ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে আসতেন না তিনি। ক্যাম্পের পেছন দিয়ে ঘুরপথে ক্যাম্প পার হওয়ার সময় হাতের ছাতা ঘুরিয়ে ধরে নিজেকে আড়াল করে দ্রুত পদে এ রাস্তাটুকু পার হতেন।

তিনি কেন ছাতা এভাবে ক্যাম্পের দিকে ঘুরিয়ে ধরেন তা আমাদের পীড়াপীড়িতে একদিন বুঝিয়ে বললেন যে, ইপিআর–রা সব সময় অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বাইচান্স তা থেকে যদি কখনো গুলি বেরিয়ে যায় তাহলে ছাতার আড়ালে থাকলে অনন্ত প্রাণটা রক্ষা পাবে। গাধার দল কোথাকার। এ সামান্য ব্যাপারটাও তোদের মাথায় আসে না।

সেদিন স্যারের ছাতা দিয়ে গুলি ঠেকানোর তত্ত্ব শুনে কচি বয়সেও আমরা মুখ চেপে ধরে হেসে উঠেছিলাম।

স্যারের মতো রোদ–বৃষ্টি ছাড়াও ছাতার ব্যবহার করতে দেখেছি আমার বড়চাচাকে। তিনি চলতি পথে কোনো মেয়েমানুষ দেখলে তার দিকে ছাতা ঘুরিয়ে ধরে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে বেগানা মানুষের মুখ দর্শনের গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন।

ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে যাত্রা হতো। *রূপবান, জ্যোৎস্না–তারা* কিংবা *আলোমতি প্রেম কুমার।* ঢোলের বাদ্য শুনলেই আমরা ছুটে যেতাম। কাদের কামারের ছেলে আনোয়ার নায়িকা সেজে কেদে কেদে বুক ভাসাচ্ছে তা দেখে আমাদের চোখ ছল ছল করে উঠতো। মনে মনে ভাবতাম বড় হলে যাত্রার নায়ক হবো। নায়কের দেখাদেখি পাটখড়ি কিংবা বাশের কঞ্চি কেটে হাফ প্যান্টের লুপের সঙ্গে তরবারি স্টাইলে ঝুলিয়ে রাখতাম। কখনো তা খুলে একে অপরের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রার ডায়ালগ বলতাম কিংবা তরবারি যুদ্ধ করতাম। আমাদের মধ্যে বর্তমানে ইউএস সিটিজেন তোজাম্মেল হক সবচেয়ে বেশি বোকা। সবাই ডাকতো *ভো....তোজা* বলে।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় তার মা রান্নাঘর থেকে ভাতের হাড়ি দুই হাতে চেপে ধরে ঘরে আনছেন। ভো...তোজা মাঝ পথে খাপ থেকে তরবারি খুলে মায়ের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠলো, *কোথায় পালাবে সুনদলী, তোমাল লুপ দেখে আমি মুউগদ হয়েছি হাঃ হাঃ –আঃ–হঃ।*

অট্টহাসির শেষের হা–টা বলার আগেই আর্তচিৎকার গলা ধরে। হাট থেকে ফেরা বাবার হাতের ছাতার গোলাকার বাট পেছন থেকে তার গলা পেচিয়ে ধরেছে ততোক্ষণে। আয় হারামজাদা, আজ তোর যাত্রার ভূত নামাই।

এলো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাড়িয়ে থাকা ১৯৭১। মিলিটারিরা আমাদের পুরো গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়ে ইপিআর ক্যাম্প–এ ঢেড়া গেড়ে বসেছে। আমরা পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যেখানে পেরেছি আশ্রয় নিয়েছি। আমার আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গের এক পাকা সড়কের ঢালে বাধা তাবুতে। আমাদের গ্রামের ডাক্তার ছিলেন হারিস কাকা। ওনার মেয়ে সেলিনা আমার সহপাঠিনী। ডাক্তার কাকাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দিল না। সেলিনা আর মাকে তার বড়ভাই তাবুর মধ্যে আমার জিম্মায় রেখে বিহারের ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিল। প্রতিশোধের আগুন বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার। বোনের অসহায়ত্ব, মায়ের মমতা উপেক্ষা করে চলে গেল মুক্তিযুদ্ধে।

আমার ওপর অর্পিত বক্করভাইয়ের দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে পারলাম না। প্রায় ৩০ লাখ লোক মরে বেচে আছি অপেক্ষায়, কবে দেশ স্বাধীন হবে। এর মধ্যে শুরু হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অতিবর্ষণে চারদিকে থৈ থৈ করছে পানি। তাবুর মধ্যে ঢুকলো বলে। ইন্দিরা গান্ধীর দয়ায় রিলিফের চাল দুই বেলা পেটে জুটলেও তা বের করার পথ প্রায় বন্ধ। রাতের বেলায় লোক চলাচল বন্ধ হলে পাকা রাস্তা ভরসা। রাস্তার ওপরই প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়। দিনের বেলায় নিম্নচাপ দেখা দিলে ছাতা বগলে করে পানি ভেঙে মাঠের মধ্যে নেমে যাই। কোথাও একটু উচু ডাঙ্গা

পেলে সামনে ছাতা মেলে নিজেকে আড়াল করে বসে যাই। পেছনটা কেউ দেখে দেখুক, *কুছ পরোয়া নেহি,* মুখ না দেখতে পেলেই হলো। কিন্তু মেয়েদের বেলায় সে সুযোগটুকুও নেই।

ছিপছিপে হালকা–পাতলা গড়নের সেলিনা ক্রমেই আমাকে কাছে টানছে। এটাকে প্রেম বলে কি না জানি না। তবে গাঢ় বন্ধুত্ব বলা যায়। এতোদিনে পিতৃশোক কাটিয়ে উঠেছে। লম্বা দুপুরে আমার সঙ্গে লুডো খেলে আর খুনসুটি করে সময় পার করে।

একদিন লুডো খেলার সময় বেচারির প্রচণ্ড বেগ এসেছে প্রস্রাবের। বাইরে গিয়ে ছাতা মেলে ধরে সেরে আসার জন্য বললাম। প্রথমে না বললেও চাপ ঠেকিয়ে না রাখতে পেরে রাজি হলো। তাবুর দিকে পেছন করে সামনে ছাতা মেলে ধরে বসেছে। কল কল শব্দে ঝরণার পানি কূল ভেঙে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ করে কোত্থেকে এক দুষ্ট হাওয়া এসে ঝটকা মেরে ছাতা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেললো সামনের পানির মধ্যে। সেলিনা দুই হাতে পাজামা চেপে ধরে ভো দৌড়ে তাবুর মধ্যে।

হাটু পানি ভেঙে ছাতা তুলে আনলাম। তার ফর্শা মুখটা আপেলের রঙ ধারণ করেছে, লজ্জায় মরে যাচ্ছে। হাসতে হাসতে বললাম, দমকা হাওয়া না এলে তোর এ জায়গাটুকু কি কোনোদিন দেখতে পারতাম? আর যায় কোথায়, *কুত্তা* বলে আমার বাজুতে এমন জোরে কামড় বসালো যেন এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে সেখানে তার সমস্ত লজ্জা দাফন করবে।

সউদি আরব থেকে

মালিকের খোজে

—মোহাম্মদ বুলবুল আহমেদ

ছাতা দেখলে এবং ছাতার কথা উঠলে আমাকে এখনো বিচলিত করে।

ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। আমার অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিন। পরীক্ষা দিয়ে সবার শেষে বের হচ্ছি। দেখলাম টেবিলের পাশে একটি আধা নতুন ফোল্ডিং ছাতা পড়ে আছে। আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে নয়, ছাতাটি কাছে রাখলাম এই ভেবে আমাদের সহপাঠী বন্ধুবান্ধবীদের কারো হবে। ভুলক্রমে ফেলে রেখে গেছে। উল্লেখ্য, সেদিন শুধু আমাদের বিভাগের পরীক্ষা ছিল। পরবর্তী কালে ক্লাস শুরু হলে মালিককে খোজ করে ছাতাটি দিয়ে দেবো। কিন্তু ক্লাস শুরু হলে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম ছাতাটি আমাদের ক্লাসের কারোর নয়। পরে ছাতাটির আসল মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য একটি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। তবে ছাতাটির মালিককে খুজে পাইনি।

ছাতাটি আমাকে বিপদে ফেলেছে। পাওয়া জিনিস,ভোগ করতেও পারি না আর ফেলে দিতেও পারি না। আজও মনে মনে ছাতার মালিককে খুজি। যদি পেতাম তাহলে ছাতাটি সানন্দে তাকে ফিরিয়ে দিতাম।

শনাক্তকরণের সুবিধার্থে কিছু তথ্য বর্ণনা করছি। ছাতাটি পেয়েছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবনের চতুর্থ তলার পাচ নাম্বার এক্সাম হলে (পরীক্ষার হল)। ছাতাটির রঙ নীল। আজো ছাতাটি সংরক্ষিত। এই লেখা যদি যাযাদিতে ছাপা হয় এবং ছাতাটির মালিক যদি এই লেখা পড়ে থাকেন তাহলে আমার (লেখকের) সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাতাটি গ্রহণ করে দায়মুক্ত করবেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

স্বপ্নভঙ্গ

– – **শান্তা নাজনীন**

আমি আর ভাইয়া তখন খুব ছোট। মা ঢাকায় যাবেন। আমরা মায়ের পিছু নিলাম। উদ্দেশ্য, ঢাকায় বেড়ানোর। ভাইয়ার জেদ আর আমার কান্নাকাটিতে আমাদের যাওয়ার বিষয়টি পাস হলো। তখন সবেমাত্র গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা ঢাকায় গেলাম এবং বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় বেড়াচ্ছি মায়ের সঙ্গে। হঠাৎ আমরা দুই ভাইবোন আবদার ধরলাম ছাতা কিনে দিতে হবে।

আমাদের এমন আবদার মা বুঝতে না পেরে বললেন, ছাতা কিনবি কেন?

বললাম, সবাই সুন্দর সুন্দর ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকেও একটা সুন্দর ছাতা কিনে দিতে হবে। ভাইয়াও আমার সঙ্গে *ছাতা ছাতা* করে পাগল হয়ে গেলেন। মা তখন কোনো উপায় না পেয়ে আমাদের দুজনকে নিউ মার্কেটে নিয়ে গেলেন। আমরা বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে ছাতা দেখছি। দোকানদাররা বলছে, মামণি এই ছাতা নাও। ভাইয়াকে বলছে, বাবু এই ছাতাটা নাও। টিপ দিয়ে খুলে খুলে ছাতা দেখাতে লাগলো। শেষে কোনোটাই পছন্দ হলো না। মা আমাদেরকে গাউসিয়ায় নিয়ে গিলেন। সেখানেও অনেক ছাতা দেখলাম।

এক সময় একটা হলুদ ছাতা আমার এবং ভাইয়ার খুব পছন্দ হলো। এর ওপর সুপারম্যান এবং স্পাইডারম্যানের ছবি আকা এবং প্রতিটি শিকের সঙ্গে প্লাস্টিকের বল ঝোলানো আর ছাতার নিচে হাতলের সঙ্গে বাশি ঝোলানো। আমাদের দুইজনের ভীষণ পছন্দ হলো এবং মাও বললেন, সুন্দর।

অবশেষে ছাতাটা আমাদের হলো। দোকানদারের কথা অনুযায়ী ছাতাটা তখন ছিল সবচেয়ে নতুন মডেলের এবং বাংলাদেশে এই জাপানি ছাতা মাত্র কয়েকটা এসেছে। আমরা খুশিতে ছাতা মাথায়

দিয়েই মার্কেটের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। ভাইয়া বললেন, দেখিস এই ছাতা দেখে সবাই কেমন অবাক হয়ে যাবে।

আমরা ঢাকা থেকে ফিরলাম। সবাই আগ্রহের সঙ্গে বললো, ঢাকা থেকে কি নিয়ে এসেছিস। ফট করে ছাতাটা খুলে বিজ্ঞাপনী ভঙ্গিমায় বাশি বাজিয়ে দেখালাম সেই ছাতাটা। সবাই সুপারম্যান এবং কার্টুন মার্কা ছাতা দেখে তো অবাক। সবাই ছাতা দেখলো আর প্রশংসা করতে থাকলো। সবারই পছন্দ হলো এবং ছাতাটার ওপর লোভ হলো। বেশি পছন্দ হলো আমার মেজমামার যিনি কি না বদমেজাজি, যখন কথা বলেন সাত পাড়ার মানুষ তার কথা শুনতে পায় এবং কথা শেষ হলো মানে চেচানো শেষ হলো। হিসাব করে দেয়া যায় কথা বলেছেন দুই তিনটা এবং বাকি সব অকথ্য বকাবকি।

পড়া ছেড়ে আমরা যখনই সময় পেতাম তখনই ছাতা নিয়ে ঘরের মধ্যে খেলতাম। কোনো সময় বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বলতাম, এখন বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বুয়াকে ডেকে বলতাম, এই বুয়া, দেখতে পাচ্ছো না বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতাটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো? ভিজে যাচ্ছি তো!

স্কুলে যাওয়ার সময় মাকে বলতাম, মা, আজকে আকাশে কেমন মেঘ। ছাতা দাও, বৃষ্টি হতে পারে। মা হাসি দিয়ে বলতেন, বৃষ্টি হবে না।

তখন বলতাম, স্কুল থেকে আসার সময় যদি খুব রোদ হয় তখন কি হবে। তাড়াতাড়ি ছাতাটা দাও। রোদে দুইজন আসতে পারবো না। আসলে সেটা ছিল বাহানা মাত্র। কারণ স্কুলে ছাতা নিয়ে বন্ধুদের দেখানোর উদ্দেশ্যটাই প্রধান ছিল।

মোট কথা, ছাতা নিয়েই যেন পৃথিবী আমার। সেই সময় মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাহানা করে মেজমামা ছাতাটা বাইরে নিয়ে যেতেন রোদ থাকলে রোদের বাহানায়, বৃষ্টি হলে বৃষ্টির কথা বলে। তিনি ছাতাটার প্রেমে পড়েছিলেন।

তিনি এমন করে প্রায়ই আমাদের প্রাণের প্রিয় ছাতাটা নিয়ে যেতেন। আর ফিরে এলে দেখতাম হয় শিকের মাথায় বল নেই অথবা দাগ কাটা ছাতার গায়ে। কোনো কোনো জায়গায় ছোটখাটো ছেড়া। ভয়ে আমরা কিছুই বলতে পারতাম না। কিন্তু মনে মনে খুব রাগ হতো, কষ্ট পেতাম।

মাকে বলতাম। কিন্তু কোনো লাভ হতো না। অনেক কান্নাকাটি করার পরে ছোট মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পেতাম যে, তবুও তো ছাতাটা এখনো জীবিত আছে।

একদিন বিকেলে আমরা দুই ভাইবোন ঘুম থেকে উঠে বুয়াকে ডেকে বললাম, বুয়া, ছাতাটা কোথায়? এখানেই তো রেখে ছিলাম।

বুয়া বললো, *আপনারা যহন ঘুমাইছিলেন তহন আপনের মামা এসে ছাতি নিয়ে গেছে।*

আমার মন ভীষণ খারাপ হলো। আসলে তখন ছাতাই ছিল আমার একমাত্র খেলার সঙ্গী এবং সমস্ত আনন্দ। মা চাকরি করতেন। বাসায় অনেক মানুষ ছিল। কিন্তু সবাই বড়। আমার যতো খেলা ছাতাটা ঘিরে। সেদিন আর খেলা হলো না।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ মেজমামা বাসায় এলেন এক হাতে একটা বাট এবং অন্য হাতে হলুদ কাপড়। আমরা কোনো কিছু বুঝে উঠতেই মামা বললেন, *এই লে তোদের জাপানি ছাতা। কি যে ছাতি কিনে লিয়ে আইছিস, শালার চোরকেও যুত করে মারবের পারলাম না, দুই বারি দিলেম আর ফাতা ফাতা। এই সব মার্কা ছাতি আর কিনবু না।*

আমরা দুই ভাইবোন বিমোহিতের মতো কথাগুলো শুনলাম। বিশ্বাসই করতে সময় লাগছিল যে, ছাতাটার এই অবস্থা! শুধু এটুকু বলতে পারি, চোখ দিয়ে ফোটায় ফোটায় পানি ঝড়ছে। আমি হাউ মাউ করে এক সময় কাদতে থাকলাম। মামাকে আর কিছুই বলতে পারিনি যদি দুই নাম্বারী ছাতা কেনার দায়ে আমাদের পেটায়।

শেষে ভাইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এর চেয়েও আরো ভালো ছাতা আমাদের হবে। আমাদের দুই ভাইবোনের জাপানি ছাতা এভাবে বাঙালি ব্যবহার হয়েছিল। যদিও আমি এখন অনার্স পড়ি তবুও সেই ছাতার দুঃখ বোধটা আমাকে মাঝে মাঝেই পীড়া দেয়।

পাবনা থেকে

অপরাধী

- - রুকু

ছোটবেলা থেকেই আমার ছাতার প্রতি লোভ ছিল। একটু কড়া রোদ উঠলে বা বৃষ্টি হলে ছাতা ছাড়া বের হতাম না। যখন ময়নামতি হাই স্কুলে পড়তাম তখন আমরা তিন বান্ধবী ছিলাম। উচু পাহাড়ের ওপর ছিল স্কুল ভবন। বড় বড় পাহাড়ি গাছ সব কিছু মিলেই যেন ময়নামতি হাই স্কুল সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

সেদিন ছিল খুব বৃষ্টি। আমার ছাতার বাট ভেঙে গিয়েছে বলে কষ্ট করে কাগজ মাথায় দিয়ে স্কুলে আসতে হয়েছে। স্কুলে পৌছে দেখি লাইলী ছাতা নিয়ে এসেছে। লাইলীকে বললাম, তোর বাড়ি তো

কাছেই ছুটির পর আমাকে একটু ছাতাটা দিস। লাইলী আমাকে না করে দিল। রাগ করে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি চললাম। পেছন থেকে লাইলী, নাজমা দৌড়ে এসে আমাকে ছাতা সাধলো। আমার রাগ আরো বেড়ে গেল। নাজমাকে ধাক্কা দিতেই লাইলীর ওপর গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে লাইলী পাহাড় থেকে পিছলে নিচে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তারপর থেকে লাইলীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, কারণ তার ডান পা-টা ভেঙে গেছে। আর্থিক অবস্থার জন্য চিকিৎসা করাতে পারিনি। লাইলীর চিন্তায় তার মা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়লো। ক্রমেই তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে লাইলীকে দেখার জন্য যাওয়া হতো। কিন্তু তার সামনে যেতে আমার ভয় হতো। তার এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করলাম।

তখন থেকে আজো পর্যন্ত নিজের মনের মধ্যে এক অপরাধ বোধের সৃষ্টি হয়ে আছে। লাইলীর জীবনেও নিশ্চয়ই অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সব আমারই কারণে নষ্ট হয়ে গেল।

কিছুদিন পরেই ঢাকায় চলে আসি। আসার সময় আমার মুখ থেকে একটিবারও ক্ষমা শব্দটি বের হয়নি। এরপর থেকে যতো ঝড় বৃষ্টি এসেছে, একবারের জন্যও আর ছাতা হাতে নিইনি।

ছাতা দেখলেই কেবল লাইলীর অসহায় চেহারাটা আমার সামনে ভেসে ওঠে। আর মনে মনে বলি, লাইলী, তুই যেখানে থাকিস, আমাকে ক্ষমা করে দিস।

জুরাইন, ঢাকা থেকে